চতুর্থ অধ্যায়

সমরেশ বসু ও কালকূট-এর উপন্যাসে অরণ্য ও আরণ্যক জীবন

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার হলেন সমরেশ বসু। ব্যাপক, বিশাল অভিজ্ঞতার ফসলে তিনি বাংলা কথাসাহিত্য, বিশেষতঃ উপন্যাসকে, অসাধারণ পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছিলেন। দেখার চোখ কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে, উপলব্ধি কতটা গভীর হতে পারে - তা দিয়ে সমরেশের সৃষ্টি আমাদের বারবার বিস্ময়াভিভূত করে। লেখকের দ্বৈত সত্তা - 'সমরেশ বসু' ও 'কালকূট' দুইভাবে এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতাকে কথারূপ দিয়েছে। সমরেশ বসু যেন জীবনের অলিগলিতে প্রবেশ করেছেন, তার শ্বাসপ্রশ্বাস ধুলোবালি গায়ে-চোখে-মুখে মেখেছেন অকপটে, আর কালকূট যেন জীবনকে দেখেছেন সন্ন্যাসীর মতো - অপার নির্লিপ্ততা নিয়ে। সমরেশ নিজেকে মিলিয়ে দেন স্থান-মানুষ-সময় সবকিছুর মধ্যে। 'আমিত্বের' বদলে এখানে চরিত্রগুলো এবং পারিপার্শ্বিকতা প্রধান হয়ে ওঠে। আর কালকূট-সত্তায় এক 'আমি'র নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে শুধু দেখার নেশা - 'বিচিত্রের পিপাসা মেটানোর তাগিদে' শুধু 'চরৈবেতি', কালকূট যেন বন্ধনমুক্ত এক দার্শনিক-সত্তা কিংবা আকাশে ডানা মেলা এক পাখি।

এই দুই সত্তাকে অবলম্বন করেই সমরেশ বৈচিত্র্যময় জীবন ও স্থান দেখেছেন। এই পরিভ্রমণে অরণ্য তাঁকে অবশ্যই টেনে নিয়েছে অমোঘ আকর্ষণে। অরণ্যের অন্দরে ও অন্তরে প্রবেশের আকুতি বোধহয় তিনি পেয়েছেন অরণ্য-সাহিত্যের সম্রাট বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই। কালকূট ছদ্মনামে প্রথম উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে তাই তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি - ''ঋণতঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে - যাঁর পদচিহ্ন ধরে বনের মন-কে স্পর্শ করতে চেয়েছি।''[১]

অরণ্য-অভিজ্ঞতার পটভূমিতে সমরেশ বসু-র কলমে আমরা পেয়েছি অনন্য উপন্যাস 'দুই অরণ্য' এবং কালকূট-এর নামে তিনটি সম্পৃক্ত উপন্যাস 'মন চল বনে', 'বনের সঙ্গে খেলা' এবং 'প্রেম নামে বন'।

সমরেশ বসু রচনাবলীর তৃতীয় খন্ডে 'ব্যক্তির সংকট ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক মুখবন্ধে বিদগ্ধ সমালোচক ও সমরেশের কাছের মানুষ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,'' 'দুই অরণ্য'-এর বিষয় অধ্যয়নলব্ধ নয়। তিনি ভারতবর্ষের বহু খ্যাত নানা অরণ্যভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সারান্দার জঙ্গলের পটভূমি এবং সেই পটবিধৃত চরিত্র এই উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে। মূল চরিত্র চেকো। চেকোর জীবন ও অভিজ্ঞতা, তার চেতনার ভাঙাগড়া উপন্যাসের মূল বিষয়। অরণ্যপটে লেখা উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে এর আগেও আমরা পড়েছি। বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর থেকে মহাশ্বেতা পর্যন্ত উজ্জ্বল সে অরণ্যসাহিত্যের ইতিহাস। তার মধ্যে সমরেশ বসু-র 'দুই অরণ্য' অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র স্থান দাবি করে।''[১]

'দুই অরণ্য'-এর এই স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে অবশ্যই অরণ্যের অনুপুঙ্খ উপস্থিতিতে। সমরেশ অরণ্যকে কত কাছ থেকে দেখেছেন, আরণ্যক মানুষজন, তাদের রীতি -সংস্কার-কুসংস্কার-ভাষা-সংস্কৃতি সব কিছুকে কতটা আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছেন তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এই অরণ্যভিত্তিক উপন্যাসটি। একটা গোটা অরণ্যকে তার সমস্ত স্বকীয়তা সহ এই উপন্যাসে ধরে রাখা হয়েছে। যার কথা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে , অনুভূতি দিয়ে, কাজ দিয়ে, পর্যটন দিয়ে সমরেশ এই অরণ্যকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন সে এক আরণ্যক যুবা, এক মুন্ডা জোয়ান 'চেকো'। যার বর্ণনা সমরেশ এভাবে দিয়েছেন - '' ...অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ দুটি মুন্ডা চোখ। কালো ছোট ছোট দুটি চোখের অনুসন্ধিৎসার ওপারে, যেন দুটি রোদ চলকানো গভীর লোর। লোর, বর্ষায় ভরে ওঠা বন্য জলাশয়ের মতো। গভীর দুটি চোখে এক রুদ্ধ হাসি যেন থমকে রয়েছে। সারন্দার কালো পাথরে কোঁদা শক্ত জোয়ান। কৃষ্ণনীল কোড়া হাতির মতো, কৈশোর পেরিয়ে যে প্রথম যৌবনের মদে গর্বিত। কিন্তু শান্ত।''[২]

'দুই অরণ্য' জুড়ে অরণ্য আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। এ উপন্যাসের শৈলী ও ভাষা বাংলা উপন্যাসে একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। এক অসাধারণ আরণ্যক ভাষায় সমরেশ সব ঘটনাবলীকে অত্যন্ত বিশ্বাযোগ্য করে তুলেছেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন -''দুই শব্দটির জন্য কাহিনী হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। অরণ্য-পরিবেশ থেকে চেকো এসে পৌঁছয় সন্তোষের হাত ধরে শহরে। অরণ্যে যেমন সন্তোষকে পথ দেখিয়ে চিনিয়ে নিয়ে যায় চেকো- এই অদ্ভুত জন-অরণ্যে তেমনি সন্তোষ হাত ধরে রয়েছে চেকোর। ...

চেকোর মৌল আরণ্য অভিজ্ঞতা আর এই দুর্বোধ মেট্রোপোলিসের সার্বিক অ্যানোনিমিটির সংঘর্ষে জায়মান এক নতুন কালের ভারতীয় নাগরিক। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ''দুই অরণ্য গভীর গম্ভীর উপন্যাস। বিষয়ের টানে এই উপন্যাসের গদ্যশৈলীতেও এসেছে একটা স্বাতন্ত্র্য।...'গঙ্গা'র ভাষা থেকে এ ভাষা আলাদা। এবং সব থেকে বড় কথা ফাঁকা রোম্যান্টিকতার বোদা আওয়াজ নেই।''[৪]

স্বপ্নিল রোমান্টিক ভাষায় সমরেশ অরণ্যকে আঁকেননি। অরণ্য বাস্তবতঃই যা - পাতায় পাতায় তাই উঠে এসেছে এ উপন্যাসে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল এ উপন্যাস কোনো নাগরিক-চোখ বা নাগরিক-মনের বিশ্বাস বা নাগরিক-উচ্ছ্বাস নয়, অরণ্য উঠে এসেছে আরণ্যক যুবক চেকোর জীবনাচরণ ও জীবনবোধ থেকে। মুন্ডা এই যুবক বাংলা অরণ্যসাহিত্যে যত চরিত্র এসেছে তার মধ্যে বিশিষ্ট জায়গা অনায়াসে দখল করে নেয়। বুনো বস্তির বাসিন্দা এই যুবকটির চলাচল অরণ্যেই। অরণ্যকে তাই তার আলাদাভাবে চিনতে হয়নি। জন্মসূত্রেই অরণ্য তার আত্মীয়। এর গাছপালা, পশুপাখি, নদীপাহাড়,রঙবদল...সব তার জানা। অনুভূতিপ্রবণ হওয়ায় অরণ্য তার কাছে শুধুমাত্র নিসর্গ বা পরিবেশ নয়, অরণ্যের জীবন্তসত্তা তার উপলব্ধিতে ধরা দেয়। তার এই অরণ্যবোধে দার্শনিকতা ও গভীর জীবনবোধের ছোঁয়া লাগে তার মাতামহ গোমা বুড়ো-র সান্নিধ্যে, যার স্নেহে চেকো লালিত-পালিত। চেকোর মাত্র এক বছর বয়সে এক অজানা আরণ্যক রোগে তার বাবা কান্দ্রা ক্যারকাটা মারা যান এবং তার মা জেমো এক খ্রীস্টান মুন্ডা জোসেফ সুইয়া(যার মুন্ডা নাম ছিল মনসিদ সুইয়া)-কে বিয়ে করে মিশনারীদের কাছে চলে যায়। চেকোও মিশনারী হতে পারতো। কিন্তু অরণ্য-সচেতন মাতামহ-মাতামহীর ইচ্ছা নয়, নাতি জাত খুইয়ে মিশনারী হয়ে যাবে। তাই দশ বছরের চেকো আশ্রয় পায় আরণ্যক গোমা বুড়ো-র কাছে। চেকো-দের বনবস্তির নাম এদেল-বা, গ্রামের নাম শিমূলফুল।''আংকুয়া আর তিরিলপোষি, দুই অরণ্যভাগের মাঝখানে গ্রাম শিমূলফুল। গভীর বন, উঁচু পাহাড় চারদিকে, মধ্যখানে বসতি। বন-কাটা ঘর, ছাড়া-ছাড়া। ঘর, চেকোদের ওড়া। লালমাটির দেয়াল, ঘাসের চাল। সারন্দার মাটি, পাথর মেশানো। দীখুদের পাকা মোকামের কাছে হার মানে না। হাতি গা ঘষলে আগে ফাটবে, তারপরে পড়বে।''[৫] এখানেই অরণ্যের নিটোল সান্নিধ্যে চেকো বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু যৌবনের দিকে পা বাড়াতে-বাড়াতে তার মধ্যে এক অস্থিরতা। শহুরে টান তাকে উদভ্রান্ত করতে থাকে।

কলকাতা থেকে আগত মোটর-মেকানিক সন্তোষ এবং অন্যান্য শহুরে মানুষদের (যারা মুন্ডাদের কাছে দীখু) দেখেই হয়তো এই অস্থিরতা। এর মধ্যেই চেকো পেল ফরেস্টগার্ডের চাকরি। বনবস্তিতে প্রায় অপ্রত্যাশিত। তাই সরল আরণ্যক মানুষেরা আনন্দে উদ্বেল হয় - ''...সুমি নাচছে। শুকরম, কান্ডে, সোমরা নাচছে। আর নাচছে চেকো। চেকো ফরেস্টগার্ডের প্যান্ট পরেছে, জামা পরেছে, পরেছে গলাবন্ধ। পিতলের বোতাম আগুনের আলোয় ঝিকমিক করছে। কোমরে বেঁধেছে বেল্ট। পায়ে পরেছে পটি, জড়িয়ে জড়িয়ে। জুতো পরতে পারেনি। পরেছিল। পরে, ঘর থেকে বেরোতে গিয়েই পিছলে গিয়ে আছাড় খেয়েছে। কান্ডে, সোমরারা হাততালি দিয়ে হেসেছে। চেকোর বন্ধু ওরা। সাকিম। সবাই হাত দিয়ে, বুলিয়ে বুলিয়ে দেখেছে ফরেস্টগার্ডের পোষাক। সব, গাঁ-সাকিমের দল। গাঁয়ের বন্ধুরা। বলেছে,'কী সুন্দর গন্ধ রে চেকো।' হ্যাঁ, খাকি রং-এর পোষাকগুলোতে একটা সুন্দর গন্ধ ছিল। ভুট্টা পোড়ার মতন, দাঁত দিয়ে কামড়ে দানা তুলে নিলে ভিতরে যে গন্ধটা বেরোয়, সেইরকম। সবাই শুঁকে শুঁকে দেখেছে। গাঁ-হড়েরা সব এসেছিল সাঁজবেলায়। গাঁয়ের মানুষেরা। নতুন ফরেসগার্ড... এদেলবার এই প্রথম ছেলে, সরকারি বন-বাংলার কাজে যাচ্ছে। পোষাকটা পরতে চেকোর হাত কাঁপছিল, ঘাম হচ্ছিল।...গাঁয়ের দু-ঘরে ডিয়েং তৈরী ছিল। চেকো ঘর থেকে চাল বার করে দিয়েছে। বদলে তিন জালা ডিয়েং নিয়ে এসেছে। একে একে সবাই এসেছে।''

অরণ্যজীবনের এই যুথবদ্ধতা, নির্ভেজাল আন্তরিকতা, দুঃখ-সুখ ভাগাভাগি করে নেওয়া অরণ্যের বিস্তৃতিরই অঙ্গ। শহরের হাতছানি চাপা পড়লো এক আরণ্যক রমণীর টানেও। মাংরি। -''মাংরির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। একহারা, ঢলঢলে, মাটি থেকে ওঠা প্রথম লতার মতো। একহারা বলে কি মাংরির বুক অমন দিন্দাবুরুর মতো গম্ভীর আর উঁচু মনে হয়। গম্ভীর আর অলৌকিক স্তব্ধতায় নিথর। কাঁপলে যেন ধসিয়ে দেবে সব। পাহাড়ের মাথায় হুমড়ি খেতে উদ্যত পাথরের নীচের খাদ আর অন্ধকারের মতো ওর বুকের তলাটা। তারপরে হঠাৎ আবার পাথর জেগে উঠেছে, বিশাল, শক্ত, উপুড়-করা নাকাড়ার মতো।'' এই নারী-শরীর বর্ণনাও যেন বুনো,আদিম,আরণ্যক। চেকো বাঁধা পড়লো এই মাংরির মধ্যে। অরণ্য-যুবতী মাংরি ও তার বুনো দেহের আস্বাদ নিয়ে গভীর বন, সর্পিল নদী, ছমছমে রাত পেরিয়ে চেকো

পৌঁছলো লোয়াকদা-য়। এও বনবস্তি।

''এ গ্রাম ছোটনাগড়ার মতো নয়। অনেকটা বরং এদেলবা-র মতো। বনের মধ্যেই, যেখানে ফাঁক পাওয়া গেছে সেখানে বাসস্থান উঠেছে। কিন্তু একটা বিশ্রামের বাংলো আছে। বনবিভাগের কয়েকটা আলাদা ঘর আছে। ..

''পশ্চিমে দক্ষিণে চাষের জমি রয়েছে কিছু। চাষ হয়েছে সবই কুরথি। নাইলের ধারে, গাছের ওপরে মাচান। রাত জেগে পাহারা দিতে হয়। মারাংহোরোর উৎপাত আছে নিশ্চয়। ময়ূর তো এমনিতেই, দূরে দূরে কয়েকটা চোখে পড়ছে,ঘাস বনের পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে। যেন পোষা মুরগীর মতোই খুঁটে খুঁটে পোকা খাচ্ছে। গ্রামটা কেঁদু কদম আর পলাশ অনেকগুলো বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধ করম আর পিয়াশালও কম নেই। মহুয়া অনেক। ..জনের পিছু পিছু ঘরের মধ্যে ঢুকল চেকো। দুটো ছোট ছোট জানালা আছে। ঘরের পিছনে, একটু ফাঁক রেখে, পরপর কয়েকটা তুন শাল আর রোহান গাছ। কাছাকাছির মধ্যে দুটো মুন্ডাখাড়াও চোখে পড়ে। সাজনেখাড়া যাকে বলে। বনশিউলির জঙ্গল আর সর্জমলতা, পিছনের বনকে বেশ আঁধারে ছেয়ে রেখেছে।''[৯]

এই আরণ্যক গ্রামে অরণ্য-যুবা চেকো-র কর্মজীবন শুরু হল। অরণ্যকে পাহারা দেবার চাকরি। লোয়াকদায় সে নির্বাসিত বোধ করে নি এই অরণ্য-পরিবেশের কারণেই। তাই প্রতিবেশিনী যুবতী ক্রিশ্চিনার গান শুনে তার মনে হয় - ''লোয়াকদায় বসে যেন এদলবার গান শুনছে চেকো।''[১০]

এই এদেলবায় চেকোর একাকিত্ব মুছলো মাংরির আগমনে। সংসারী হল চেকো। বুনো সংসার । কিন্তু একলা বনে কাঠ কুড়োতে গিয়ে মাংরি ভালুকের আক্রমণে প্রাণ হারালো। আর তখনই চিরসাথী অরণ্য-এর চেহারা পাল্টে গেল চেকোর চেতনায় - ''জঙ্গল চেকোকে গিলতে এল। ওপারের জগৎটার প্রতি ওর ভিতরের টানটা এবার আরও সজাগ হল। নাড়া খেয়ে উঠল। এমন ভয়ংকর আদিমতার মধ্যে, হিংস্রতার মধ্যে, ওপারের জগৎটা ওর কাছে জ্বর-আরোগ্যের মতো মনে হল।''[১১]

চেকো মোটর-মেকানিক সন্তোষের হাত ধরে মহানগর কলকাতায় চললো। যদিও একদা উচ্চ বনকর্মী, পরে বনের টানে মুন্ডা জীবন বেছে নেওয়া অসাধারণ চরিত্র

আলফ্রেড গোমা বুড়ো-র কাছে শহর সম্পর্কে বলেছিল- ''আমাকে যদি বলতে বলো, তো আমি বলি, সেটাও একটা জঙ্গল হে গোরো। তোমার এ সারন্দার মারাং-হোরো, লাড়কা কিছু নয় হে। হাতি আর বাঘেরা কিছু নয়। সে আরও ভারী জঙ্গল, সেখানে তুমি শিকার করতে পারবে না। সেখানকার কানুন আলাদা। জানোয়ারদের তুমি নাগাল পাবে না। কিন্তু জানোয়ারেরা তোমার নাগাল পাবে।''[১১]

চেকোকে কলকাতা যাবার আগে আবারো আলফ্রেড মনে করিয়ে দিলেন - ''যেতে চাস, কোড়া, ঘুরে আয়। তবে জেনে রাখিস, ওখানেও তুই থাকতে পারবি না। তবে হ্যাঁ, কয়েকটা দিন ভুলে থাকতে পারবি। সেখানেও অনেক ভালুক আছে রে, আমি জানি।''[১২] সন্তোষ এ-কথার রেশ ধরে বললো - ''ভালুক মানে ? বালচোত সব রকম জানোয়ার আছে।''[১৩]

তবু চেকো কলকাতায় এলো অরণ্য ছেড়ে। শুরু হল আরণ্যক চেকোর মনে নগর ও অরণ্যের দ্বন্দ্ব। তার প্রথম অভিজ্ঞতাই এমন - ''সারন্দার জঙ্গলের গাছের থেকে রাস্তায় ঘাটে মানুষ বেশি, গাড়ি বেশি। গাছ বাঁচিয়ে তবু চলা যায়, তারা নিশ্চল। আর মানুষ সচল। কেবলি ধাক্কা খায়, আর ধাক্কা খেয়ে কখন পড়ে যাবে, তার ঠিক নেই। কেন, এটা তো হাট নয়, মেলাও নয়, রাস্তা। চেকোর ভিতরটা আড়ষ্ট হয়ে রইল।''[১৪] কিংবা - ''এত মানুষ ! ডি এফ ও-এর থেকে ভালো পোষাক-পরা হাজার-হাজার পুরুষ,আর ঝকঝকে পোষাক-পরা মেয়েরা, আর কত গোরা সাহেব মেম। আর এত গাড়ি ! সারন্দায় একমাত্র পিঁপড়েরাই এরকম সার বেঁধে চলে। এবং কী ভীষণ তাড়াতাড়ি চলছে সবাই। অথচ হাসছে, কথা বলছে। চেকোর মনে হল, নাচছেও। সব কিছুতেই এমন একটা ব্যস্ততা, সকলের এত তাড়া যেন কী একটা পাওনা সকলের ফসকে যেতে বসেছে। কী ? সেটা কী ? গুয়ায় বাংলায় মাইনে আনতে গেলেও তো কেউ এত তাড়াহুড়ো করে না। দাবানল লাগলে, বুনো পশুতে তাড়া করলে অবিশ্যি আলাদা কথা। সেরকম কিছু তো চোখে পড়ে না। একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই, যা চেকো দেখতে পায় না, কিন্তু এ শহরের মানুষেরা দেখতে পায়। নইলে তাদের সবকিছুতে এত তাড়া কীসের !''[১৫]

এই জনঅরণ্যে চেকো অসহায় বোধ করলো। সন্তোষকে আরণ্যক সরলতায় তাই শুধোয় - ''আচ্ছা, এখানে তিজু(ঝিঁঝি) কাঁদে না ?''[১৬]

এই নগর-জঙ্গলে এসে চেকো জানলো - ''যার যত টাকা, তার তত শক্তি। টাকা থাকলে সব আছে, তাই সবাই টাকা টাকা করে ছুটছে। টাকা থাকলে যা খুশি তাই করা যায়।''[১৭] সন্তোষও তাই টাকার জন্য ছুটছে - ''বুঝলি, খালি টাকা চাই, টাকা, মালকড়ি যার নাম।'' চেকোর বিস্মিত প্রশ্ন - ''টাকা ! কত টাকা ?'' এর উত্তরে সন্তোষ বলে - ''তোদের সারেন্ডা ফরেস্টের গাছে যত পাতা, তার চেয়ে বেশি।''[১৮] চেকো জানলো টাকা দিয়ে এখানে মাংরি-র মতো যুবতীদেরও শয্যাসঙ্গিনী বানানো যায়। তাই ব্যাচা (সন্তোষের মোটর গ্যারেজের কর্মী) যখন চেকো-কে দেহপসারিনীর আখড়ায় নিয়ে যায়, চেকো উদভ্রান্ত বোধ করে। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। নাগরিক ব্যাচা অনায়াসে চেকো-কে বলে- ''ওরা পয়সা পেলেই সঙ্গে থাকে, শোয়। এটাই নিয়ম। তোদের দেশে নেই ?''[১৯] চেকোর আরণ্যক চেতনায় এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট তোলপাড় তখন - ''চেকো জবাব দিতে ভুলে গেল।...কিন্তু কী করে সম্ভব, চেকো তো কোনওদিন ভেবে পায়নি। আমার শরীর-মন নিয়ে কথা। তোমাকে ভাল লাগল, মনে ধরল, সেটা আলাদা। পথ চলতি আলাপেও, হঠাৎ দুজন অচেনা মেয়ে-পুরুষ জঙ্গলে কিছুক্ষণের জন্যে লুকিয়ে পড়তে পারে। কিংবা দুজনের পেটেই ডিয়েং পড়েছে, তাই আর কান্ডজ্ঞান নেই, কার সঙ্গে কী হল, টের পাওয়া গেল না। ধরো, দূর জঙ্গলে ভিল গাঁয়ের কোড়া-কুড়িরা কাজ করতে গেল। অস্থায়ী গুইয়ো-তে (পাতার সাময়িক ঘর) দিনের পর দিন বাস করা। রোজ সন্ধ্যায় কাজের শেষে, রেঁধে খেয়ে, ডিয়েং গিলে একটু নাচগান করতে করতে, শরীর মন বশে না থাকতে পারে। মোরগার মতো হঠাৎ পাশের হাসকুটি কুড়িয়ার ঝুঁটি কামড়ে ধরে অন্ধকারে হয়তো দৌড়ুল। তা সে কুড়িটার ইশারা আছে বলেই না ! পেট থাকলেই খিদে পায়। রক্তের ভিতরেরও তো একটা খিদে আছে। একলা একলা হাহাকার করে ওঠে, মনটা দপদপিয়ে ওঠে। তখন দুজনেরই দুজনের দরকার।... কিন্তু পয়সা দিলেই কোটরি (ডিম না পাড়া মুরগি) ডাক ছাড়বে, মোরগা ছুটে আসবে, এমন কথা কেউ শোনেনি। কেন, পয়সা কি রক্তের মধ্যে ঢুকে দপদপিয়ে তোলে নাকি, মন পাগল করে নাকি সে, না শুয়ে থাকা যায় না ! পয়সার বদলে তো কাজ হয়, সে কাজ আলাদা। টাকা গায়ে ছোঁয়ালে কি রক্তও টগবগিয়ে ওঠে ?''[২০]আরণ্য-সংস্কার, বিশ্বাস, সরলতা ও নৈতিকতার সঙ্গে অবধারিতভাবে নাগরিক কপটতা, লোভ, অনৈতিক কাম ইত্যাদির সংঘাত এলো। তাই ''কলকাতাকে ভাল লাগতে লাগতেও কোথায় যেন একটা

উল্টা স্রোত বইতে লাগলো চেকোর ভিতরে। ভিতরটা নানান জিজ্ঞাসায় শক্ত হয়ে রইল।''[২১] সে যন্ত্রণাবিদ্ধ অভিজ্ঞতায় দেখলো খাদ্য-আন্দোলনের সংগ্রামীদের ওপর পুলিশী নির্যাতন। মানুষ নির্বিচারে মানুষকে মারছে। কলকাতার রাজপথ মানুষের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। চেকো শুনতে পেল কেউ একজন বলছে - ''জঙ্গলের আইন চলছে শহর।''[২২] কিন্তু চেকো জানে জঙ্গলে এমন অনৈতিক আইন নেই। জঙ্গল এই জনজঙ্গলের থেকে অনেক ভালো। চেকোর মনে হল - ''জঙ্গলের আইন ! জঙ্গলের আইন কোথায় ? এই সব যা দেখছে, এ সব কি জঙ্গলে কখনও সম্ভব ? জঙ্গলে তো চেকোর এত ভয় করে না। এত অবিশ্বাস হয় না। এমন হিংস্রতা, এমন অসহায়তা, আর একইসঙ্গে এত নির্বিকার নিষ্ঠুর আনন্দলোভী মনে হয় না। সবাই এক কথায় জঙ্গলের দোষ দেয়, কারণ তারা জঙ্গলকে চেনে না।''[২৩] চেকোর এই আরণ্যক নিষ্পাপ উপলব্ধি জঙ্গলকেই নগরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিতিয়ে দিল। সে বুঝলো, অরণ্য নগরের চেয়ে অনেক বেশী বাসযোগ্য। তাই কলকাতায় বসে সে অরণ্যের ডাক শুনতে পেল - ''চেকো অস্থির হয়ে উঠলো। জঙ্গলের জন্য ওর মনটা হাহাকার করতে লাগল। অরণ্য, অরণ্যের গন্ধ, তার মানুষ, পশু, তার প্রত্যহের জীবনে যা স্বাভাবিক, মৃত্যু, অপঘাত, দুর্ঘটনা সমস্ত কিছুই অনেক সরল সুন্দর সহজ রূপের নিবিড়তায় ডাক দিল।...লোয়াকদা-র মাস্টারের ঘরের পিছনে, সেই অজগর পাহাড়ের অন্যদিকে পাথর-চাপা মাংরি-র সমাধি। সেখানে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল চেকো।...''[২৪]

তাই কলকাতা ছেড়ে, নগরকেন্দ্রিক মোহ ছেড়ে অরণ্য-মানব চেকো অরণ্যেই ফিরে এলো। তার শান্তির আশ্রয় যেখানে। বুকে নগরের কপটতার প্রতি একরাশ বিদ্বেষ।

''গাড়ি থেকে জরাকেলা স্টেশনে নেমেই চেকোর মনে হল, ওর চোখের ওপর থেকে একটা আবছা পর্দা যেন সরে গেল। নতুন জ্যোতি ফিরে পেল। বুকের ভিতরের সকল আবছায়া কেটে গেল। বনের গন্ধ নিল প্রাণ ভরে। আঃ ! জীবনেরই তো গন্ধ এটা ! এই তো খালি গা, প্রায় নগ্ন মেয়ে-পুরুষেরা চলাফেরা করছে। এদের মধ্যে সেই জগৎটার আলো ঝলকানোর নীচেই কপট কুটিল অন্ধকারের গাঢ়তা নেই।''[২৫]

''ওর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল কলকাতায় গিয়ে। সারন্দার গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে, একটু একটু করে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল।''[২৬]

আবার ফরেস্ট-গার্ডের চাকরি। অরণ্যের সান্নিধ্যে মাংরি-কে হারাবার কষ্ট ভুলে থাকার চেষ্টা। এরমধ্যেই ঘটলো এক অঘটন। কান্ডেওড়া বনবাংলোয় ডি.এফ.ও-র অতিথিরা এসে অদ্ভুত নাগরিক উচ্ছ্বাসে মাতলেন। আদিবাসীদের নাচ দেখতে দেখতে তাদের মধ্যে একজনের আদিম-তৃষ্ণা জেগে উঠল। জোর করে সঙ্গী এক মেয়েকে বাংলোয় তুলে নিয়ে যেতে লাগলো। মেয়েটির অসহায় চিৎকার শুনে চেকোর অন্তরাত্মা বলে উঠল - ''চেকো, তুমি একজন ফরেস্ট-গার্ড। সরকার থেকে তোমাকে এই কুঠারটা সেইজন্যে দিয়েছে। তুমি নিজেকে, অরণ্যকে আর বিপদগ্রস্ত মানুষকে বাঁচাবে।''[২৭] সে একটা ঘোরের মধ্যেই যেন ধর্ষণরত লোকটিকে খুন করলো। নগর-সভ্যতার প্রতি তার বিদ্বেষ-ঘৃণা চরম পরিণতি পেল। তিন বছর জেল হল চেকোর। অবশেষে সে অরণ্যেই ফিরে এল। সে জানে সে খুনী নয়। তাই উপন্যাসের শেষ পংক্তিতে চেকোর কানে সমরেশ তুলে দিয়েছেন এক অরণ্য-গীতি, যার অর্থ - ''হে নাগে বোঙা ! শালপাতায় মুড়ে আমি হলুদ গুড়া আর ফুল জলে দিয়ে এলাম। খারাপ পোকারা নষ্ট হোক।''

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে সমরেশ ছড়িয়ে দিয়েছেন অপূর্ব আরণ্যক গন্ধ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন অরণ্যের ভেতরে বাস করেছেন, তার ফসল 'আরণ্যক'। কিন্তু অবাক হতে হয় এটা ভেবে যে, সমরেশ বসুর এমন দীর্ঘ অরণ্য-নৈকট্যের অভিজ্ঞতা না থাকলেও উপন্যাসটি কিভাবে এত বিশ্বাসযোগ্য হল, আরণ্যক জীবনের এত খুঁটিনাটি তিনি কিভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন ! বিভূতিভূষণ অরণ্যের রোমান্টিকতাকে ধরেছেন। আর সমরেশ ধরেছেন তার বাস্তবতা।

কিছু কিছু বর্ণনা আমরা এখানে উদ্ধৃত করতে পারি ঃ-

☐ 'আকাশ নীল। গভীরতর নীল যেন এই সারন্দা আরণ্যক পাহাড়। যেন পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে,সারন্দা কোয়েলের পুবে এমনি নিখর,অবিকল,অবিচলিত রয়েছে।কোয়েলের ওপারেও বন-ছাওয়া পাহাড়, পোড়াহাট অরণ্য-বিভাগ। গভীর নিশ্চুপ।'[২৮]

☐ 'সামনে বালি-চিকচিক চর। পোষের রোদ পেয়ে যেন আরামে শিউরে উঠেছে। এমনি তরঙ্গ উত্তরঙ্গ অঙ্গ বালুচর গোরু-মহিষের পায়ে পায়ে সৃষ্টি হয়েছে।আর বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট শিলা, বর্ষার প্লাবনের প্রেমে যারা এসেছে উঁচু থেকে, এখন

পরিত্যক্ত। বর্ণে রকমারি, লাল কালো সাদা, তারপরে বিসর্পিত কোয়েল। নতুন খোলস ছাড়ানো, মাহাবুরুর জঙ্গলের বিশাল রাক্ষস অজগরের মতো কোয়েল নদী, এঁকেবেঁকে ছুটছে বেগে,দক্ষিণ-পশ্চিম সমতলে।এখন যেন চেকো-দের হাতুর কিশোরী, মেয়ে মাংরি, খিলখিল হাসি, ছলছলিয়ে দৌড় দিয়েছে।'[২৯]

☐ 'আর বালুচরের ধারে, উঁচুভূমির অগভীর শালবনে, ঝিঁঝিরা চিৎকার করে চলেছে। কোনও ঝিঁঝি কর্কশ তীক্ষ্ণ স্বরে যেন করাতে কাঠ চেরাই করে চলেছে। কোনওটা বনের কাঠ বোঝাই করা ট্রাকের মতো গম্ভীর গর্জনে বাজছে। আর কোনওটা বাজছে, কটকট কটকট...সব মিলিয়ে একটা সুরের মতো।'[৩০]

☐ 'জল চলেছে সরু ধারায়।যেন পাথরের সঙ্গে নীচু সরু গলায় কথা বলতে বলতে চলেছে নালা।'[৩১]

☐ 'গাড়িটা চলে গেল। স্তব্ধতা বাড়ল। এক একটা শব্দের পর বন যেন আরও বেশি নিশ্চুপ হয়ে যায়। কাছাকাছি বোধহয় তেমন জলাশয় নেই এখানে।তাই ঝিঁঝির ডাক বিচ্ছিন্ন শোনাচ্ছে। এক এক জায়গায় মনে হয়, ঝিঁঝিদের হাট আর মেলা বসেছে। বুঝতে হবে,সেখানে জলাশয় আছে। ভেজা ভেজা অন্ধকার জায়গায় ওরা বেশি থাকে। কেন ? বোধহয় ওখানেই ওরা জন্মায়।'[৩২]

☐ 'সূর্য মাথার ওপর থেকে একটু পশ্চিমেই নুয়েছে। বন রৌদ্রময়। ছায়ানিবিড়। পৃথিবীর কোথাও মানুষ আছে বলে মনে হয় না।'[৩৩]

☐ 'মাঝে মাঝে ময়ূরের কেকা। ধনেশের চিৎকার। ক্বচিৎ সম্বরের গভীর নাদ। আর নিরন্তর বন।গোমা বুড়ো, গোমা বুড়োর বাবা এবং তার বাবার বয়সী গাছেরা, বনবিভাগের হাতে পোতা,বেড়া দেওয়া বেষ্টনীতে বাড়েনি।...এখানে গাছেরা নিজেদের জাতের বসতি করেছে খানে খানে। একজন নয় কোথায়ও। যেখানে আছে, দল বেঁধে আছে। চীহড় আলোকলতার জটায় বাঁধা পড়েছে, একজন থেকে আর একজন। লতার বাঁধন পরস্পর জড়িয়েছে হয়তো মাইল ছড়িয়ে। ছায়া তার নিবিড়, অন্ধকার তাই দিনেও।সারন্দা অরণ্যের পথ, সবখানে পাহাড় কাটা। একদিকে খাদ, একদিকে পাহাড়। থেকে থেকে প্রায়ই শুকনো পাতার খসখস বেজে উঠছে জঙ্গলের ভিতরে। হয়তো কাঠবিড়াল, বনবিড়াল, বনমোরগ, বেজি, গোসাপ।অন্য কিছু হওয়া বিচিত্র নয়।আর ওপরে, গাছের ডালে ডালে ঘষা লাগার মচমচ শব্দ।'[৩৪]

☐ 'এই নিবিড় ছায়াঘন বনের মধ্যে বাঁদরও অনেক। ওরা যত রকমে ভেংচাতে

পারে, চিৎকার করতে পারে, তাই করছে। গাছের ডাল দুলিয়ে, যেমন খুশি কাঁচা আমলকী আর কাঠডুমুর ছড়িয়ে, ছিটিয়ে, ভয় পেয়ে আর ভয় দেখিয়ে,প্রায়ই হল্লা করে উঠছে। কোথাও আবার নিতান্তই নিশ্চিন্ত, যেন বয়স্ক মেয়েরা শিশুর আদরে অন্যমনস্ক। ক্বচিৎ পুরুষের মেয়ে বাঁদরীকে নিয়ে সোহাগ।'[৩৫]

☐ 'ভালুকের উপদ্রব বেড়েছে শীতে। শীতে আর বর্ষায় ওরা উপদ্রব করে। বসন্তে আসে নিতান্তই কচি কচি মিষ্টি ফুল খেতে। তার মধ্যে মহুয়া প্রধান।'[৩৬]

☐ 'মারাংহোরো। হাতি। কোয়েনার ওপারে, জলের ধারে মাকড়া পাথরে অনেকখানি বিস্তৃত আস্তরণের ওপর দুটি হাতি। দুজনেই পূবমুখো। ...দুরান্তের নীল বনের মতো গায়ের রং। কান দুটি ঘাড়ের সঙ্গে লেপটানো। কিছু শুনতে চাইছে বোধহয়। এমনিতে নিশ্চিন্ত ভঙ্গি। ল্যাজ এবং শুঁড়, দুইই দোলাচ্ছে।দুজনের কারুরই দাঁত নেই।'[৩৭]

☐ 'যেখানে কুসুম, সেখানে রক্তাভ আলোর ছড়াছড়ি। গভীর জঙ্গলের মধ্যে বন্য মহিষেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এই রং-এর পাগলামীতে।'[৩৮]

এমন আরো অসংখ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ অরণ্য-বর্ণনায় পুরো উপন্যাসটি একান্ত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। 'দুই অরণ্য' নির্মাণপর্বে সমরেশ কত সনিষ্ঠ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় শব্দ ও বাক্য-ব্যবহারেও। অসংখ্য আরণ্যক মুন্ডা সম্প্রদায়ের শব্দ এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যে, একবারো তাদের আরোপিত মনে হয় না। এমন কিছু শব্দ ঃ-

১.দীখু(শহরবাসী) ২.বুরু(পাহাড়) ৩.হাতু(বস্তি) ৪.মারাংহোরো(হাতি) ৫.লোয়াক(ঝিনুক) ৬.কোড়া(যুবক) ৭.কুড়ি বা হাপানম(যুবতী) ৮.মারাংবুরু(বড় পাহাড়) ৯.মান্ডি(ভাত) ১০.ডিয়েং(মদ) ১১.চাউলি(চাউল) ১২.বিং(নালা) ১৩.গঞ্জু(সরকারের খাজনা আদায়কারী) ১৪.সারনা(দেবস্থান) ১৫.ওতুর(তরকারি) ১৬.মদগম(মহুয়া) ১৭.সারজং(গাছ) ১৮.তোয়া(ঋণ) ১৯.ফিকা(শালপাতার বিড়ি) ২০.তিজু(ঝিঁঝি) ২১.এদেল দারু(শিমূল গাছ) ২২.তবলা(কুঠার) ২৩.হরলসি(ঘুর্ণিঝড়) ২৪.মেরং(ছাগল) ২৫.সাড়া(মোরগ) ২৬.কোটরি(যে মুরগি এখনো ডিম দেয়নি) ২৭.গুন্ডি(গরু) ২৮.মিউং(বাছুর) ২৯.বাবা(ধান) ৩০.আপাড়(বাবা) ৩১.ডেমতা(পিঁপড়ের ডিম) ৩২.ডোরি(মহুয়ার বীজ) ৩৩.তারামাচা(টংঘর) ৩৪.দা(জল)

সমরেশের মুন্সিয়ানা এখানে যে, আরণ্যক মানুষদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত এই শব্দগুলো এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যে তাদের অর্থ প্রকাশ পেয়েছে স্বচ্ছন্দে। নগর-পাঠকদেরও হৃদয়ঙ্গমে অসুবিধে হয় না। এই পরীক্ষাটি বিভূতিভূষণেও আমরা পাই না এমন করে। আরণ্যক পটভূমি আরো বিশ্বাসযোগ্য নিপুণ হয়েছে অসংখ্য আরণ্যক গান, আরণ্যক উৎসব, বিয়ের রীতি, বন্য রীতি, আরণ্যক খাদ্য, আরণ্যক বাড়ী, আরণ্যক মানুষদের অপদেবতায় বিশ্বাস, আরণ্যক সংস্কার-কুসংস্কার ইত্যাদির নিপুণ বর্ণনায়। যেমন ঃ-

☐ গান ঃ 'নইগা নইগা নেয়াড

ওকী হোড়ো তিংগুবাকনা।

নইগা নইগা আপাড়

চিময় প্রজা গোড়ে জপগাকনা ?'[৯৯]

☐ উৎসব ঃ 'বা-পরবের পরেই আসে ফাগুয়া। এ উৎসব বনে ও বাইরে, সর্বত্র হয়। কিন্তু ফাগুয়ায়,জঙ্গলের দেবস্থানে কোনও পূজা হয় না। দীখুরা পূজা করে, আবির ছড়ায়, রং ছোড়ে। সারন্দার অরণ্যে আবির রং নেই। বিচিত্র বর্ণের মাটি আছে, লাল, নীল, হলুদ। তাই গুলেই ছোড়ে, হোড়ে, নাচে গায়।..মাঘ থেকেই শুরু, ফুল এবং ফাগুয়া পরব পর্যন্ত সারন্দা প্রমত্ত। নারী পুরুষের নির্বিচার দৈহিক মিলনের এক পালা পড়ে যায়।'[১০০]

☐ বিয়ের রীতি ঃ- 'মাড়োয়া হল বিয়ের জন্য তৈরি জায়গা। চারদিকে শালকাঠের খুঁটি, মাথায় সরু সরু শালরলার চালা, চীহড়ের পাতাসহ অনেক লতাপাতা জড়ানো চারদিকে। নীচে একটা উঁচু করা হয় মাটি দিয়ে। সেই চালাকে মাড়োয়া বলে। সেখানে বরকে নিয়ে গেল, বরপক্ষের লোকের চোখে ধুলো দিয়ে। এটাই নিয়ম। তারপরে নিয়ে আসা হল মেয়েকে। টানা হেঁচড়া করে আনতে হল। এক ডাকে যে আসতে নেই। আপত্তি করতে হবে। নইলে নিন্দে হবে যে। জোর করে মাড়োয়াতে নিয়ে আসা হল মেয়েকে। মাংরি নতুন কিচরি কোমরে বেঁধেছে এক টুকরো। গায়ে জড়িয়েছে আর এক টুকরো। গলায় ঝুটা রূপার খাঁজকাটা বলের মালা, এক রাশ পুনহার। কিন্তু নীল জামাটা মিলের কাপড়ের। খোঁপায় ঝুটা রূপার প্রজাপতি। এসে দাঁড়াল মাথা নিচু করে। পুরোহিত মারাংকুজুর উপস্থিত ছিল। তার হাতে সিঁদুর। চেকোর হাতে সিঁদুর দিয়ে বলল, 'মারাংবুরু সাক্ষী, মেয়ের

কপালে সিঁদুর পরিয়ে দাও।' বলে সে বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে লাগল। ইতিমধ্যে মেয়েরা গোটা গোটা হলুদ ধান আর খই ছিটুতে আরম্ভ করেছিল। চেকো সিঁদুর পরিয়ে দিল মাংরির কপালে। সিঁদুর লাগিয়ে দিল সিঁথেয়।'[৪১]

☐ বন্য রীতি ও বিশ্বাস ঃ 'নতুন ইজারা নিয়ে, গাছ কাটবার আগে, গুনিয়াকে দিয়ে একটা গাছকে পুজো দিয়ে নিতে হয়। নইলে কুলিরেজারা কেউ গাছ কাটবে না। আর গাছটা হওয়া চাই সেই ইজারার এলাকার মধ্যেই। পুজো না দিলে বুরুবোঙা রুষ্ট হবে। কার কী বিপদ আপদ হবে, কে জানে - কোপ মারলে গাছে, পড়ল গিয়ে আর একজনের কাঁধে। তোমার নিজেরই হয়তো মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, আর দাপিয়ে মরে গেলে। আর এই গাছেদের সবচেয়ে বড় বাহন হাতি। হয়তো একদিন গভীর রাত্রে সে তোমাদের পাতার ঘরগুলো মাড়িয়ে, তোমাদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে, তছনছ করে চলে গেল। ...অতএব পুজো। মোতি সিং-এর কুলিদের মধ্যেই গুনিয়া ছিল। সে-ই পুজো করেছে। সে উপোস করেছিল। চান করে এসে, কলকেতে গাঁজা টেনে নিয়েছে।এটা নিয়ম, পুরোহিত গাঁজার ধোঁয়া উড়িয়ে পুজোয় বসবে। গোটা সারন্দা বনে কোথাও নারকেল গাছ নেই। সে গাছ আছে দীখুদের দূর সমতলে।যেমন করে হোক, পুজোর জন্যে একটা নারকেল আনতেই হয়। ঠিকাদারই নিয়ে আসে। ভাং অতি অবিশ্যি চাই। সিঁদুর আর ধূপও বটে। বলি হচ্ছে সব থেকে বড় অঙ্গ। মুরগি বা ছাগল।'[৪২]

☐ আরণ্যক খাদ্য ঃ 'কুঠারের কোপে গাছটাকে কেটে, আকশির মতো করে, পিঁপড়ের বাসাটা খুঁচিয়ে পাড়ল। মাংরি তাড়াতাড়ি ঝোপের গায়ে বাসাটাকে ঘা দিয়ে দিয়ে লাল বড় বড় পিঁপড়েগুলোকে গা থেকে খসিয়ে দিল।তারপর মাকড়সার সাদা জালের মতো আস্তরণ সরাতেই সাদা সাদা ডিমগুলো দেখা গেল। ডেমতা। কয়েকটা তুলে, চেকোর মুখে পুরে দিল। কয়েকটা নিজের মুখে দিল। খুশিতে ও ডেমতার স্বাদে, সোনাপির অন্ধকার জঙ্গলে দুটি মুখ চকচক করতে লাগল।'[৪৩]

☐ আরণ্যক বাড়ী ঃ 'কাঠ জ্বলছে দাউ দাউ করে গোমা বুড়োর উঠোনে। ...সেই আগুনের শিখা ঘরের দেয়ালে, গোমার নিজের হাতে আঁকা হাতির কিম্ভূত মূর্ত্তি কাঁপছে। চেকোর হাতে আঁকা আন্দরি বোঙার বিচিত্র মুখ। আর পাখির ছবি। লাল দেয়ালে, কয়লার মতো কালো মাটির রং দিয়ে আঁকা। এ মাটি চেকো নিজের হাতে এনেছিল চাম্পাবার বুরুর গাঁ থেকে। সারন্দা সাত রং মৃত্তিকাময়।'[৪৪]

☐ আরণ্যক অপদেবতায় বিশ্বাস ঃ 'সাতবহিনিরা বাতাসে ঘোরে। ...সাতবহিনি, সর্বনাশী। জলের স্রোতে ওরা বাজনা হয়ে বাজে। বাতাসে গান হয়ে বাজে। মেয়েদের মনের শান্তি যায়। আর ভয়ংকর সুখ হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায়। মন পাগল পাগল করে। সাত বোন ঘাড়ে চেপে, সাত পথে টানে।'[৪৫]

☐ আরণ্যক কুসংস্কার ঃ 'হয়তো তুমি হাটে দেখলে এক মেয়েকে, অমনি তার পিছু পিছু চলে গেলে জঙ্গল পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে। মেয়েটার কপালে যে একটা সিঁদুরের ফোঁটা ছিল, সেটাই যে সর্বনাশের মূল, তা কে জানত। গুনিয়ার এক ফোঁটা মোহিনী সিঁদুরের অনেক দৌড়। আর ডাইনির দেওয়া রক্তের ফোঁটা কপালে দিলে তো কথাই নেই। যার নাম করে টিপ পড়বে, তাকে সাতবহিনি এসে সাত রূপ ধরে পাগল করে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে। - হয়তো দেখলে,তোমার যাবার পথে এক গোছা ফুল পড়ে আছে। নয়তো সদ্য ভাঙা করমের ছাটি একটি ঢাল। কিংবা কাপড়ের একটি টুকরো। যেন এমনি পড়ে আছে। কিন্তু খবরদার, পায়ে মাড়িও না। মাড়ালেই তুক।'[৪৬]

এইভাবে নিখুঁত অরণ্য-মনন সমরেশের কলমে প্রাঞ্জল উঠে এসেছে। অরণ্য কিছু নগর-মানুষকে অপার ভালোবাসায় বেঁধে ফেলেছে। ইংরেজ আলফ্রেড নাগরিকতার মুখোস ছিঁড়ে-খুঁড়ে মিশে গেছেন অরণ্যে, আরণ্যক মানুষদের সাথে, বিয়ে করেছেন আরণ্যক মুন্ডা রমণীকে। সারন্দার মেয়েপুরুষ সবাই তাকে ভালোবাসে। অরণ্য তাকে কাঙ্খিত শান্তি দিয়েছে, যা দিতে পারেনি নাগরিক বিলাস, মেমসাহেব ও সন্তানের সান্নিধ্য। আলফ্রেডের স্বীকারোক্তি - ''জীবনটাকে নিয়ে আমি শান্তিতে থাকতে চাই। আমি শান্তিতে আছি হে হোরো।''[৪৭]

মোটর-মেকানিক সন্তোষ, যাকে আপাত মনে হয় রাগী ছটফটে যুবক, যার ঠোঁটে অনবরত গালাগাল, অরণ্যের সান্নিধ্যে এসে সেই সন্তোষও শান্ত স্নিগ্ধ রোমান্টিক। তারও ইচ্ছে করে - ''এই নদীর ধারে আমার একটা বাড়ি থাকলে বেশ হত, জানিস চেকো।''[৪৮]

অরণ্যের নৈশ আওয়াজ শুনে সে বলছে - ''কী সুন্দর। কিন্তু কী ভীষণ!''[৪৯]

আবার নগর ছেড়ে হরকিষণ-মাস্টার অরণ্য-জীবন বেছে নিয়েছেন, আরণ্যক

বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন, বেছে নিয়েছেন অখন্ড নির্জনতা। চেকো দেখে - ''মাস্টারের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। অই, হে বুরুবোঙা ! তোমার বিরাট কালো সবুজ বন আর নীল আকাশের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকার সময়, মাস্টারের চোখে আমি জল দেখেছি। কেন ? ওপারের জগতের মানুষটা কেবল মাঝে মাঝে বলে, 'আমি মহববতের ব্যাধি সারাতে এসেছি হে চেকো।'...''[৫০]

এই কতিপয় ভিন্ন ধারার নগর-মানুষের সঙ্গে অরণ্যের মেলবন্ধন সম্ভব হয়েছে। কারণ এদের মধ্যে তঞ্চকতা নেই, অরণ্য-নিধনের লোভ নেই। অরণ্য এদের দিয়েছে মানসিক প্রশান্তি এবং আশ্রয়। এরা ভালোবাসতে জানে বলে আরণ্যক মানুষরাও নির্দ্বিধায় এদের ভালোবেসেছে। মাঝখানে কোনো দুর্ভেদ্য পাঁচিল ওঠেনি। সেই সাথে আরণ্যক প্রবীন মানব গোমা বুড়ো-র অরণ্যচেতনা ও গভীর জীবনবোধ 'দুই অরণ্য'কে অরণ্যকেন্দ্রিক এক অত্যন্ত শক্তিশালী উপন্যাস করে তুলেছে।

কালকূট-গবেষক শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী 'আরণ্যক কালকূট' শীর্ষক রচনাটি শুরু করেছেন এভাবে - ''ভ্রমণের মন প্রস্তুতি ঠিক ইচ্ছায় হয় না। এর পেছনে থাকে একটা 'সময়' ও 'আহ্বান'-এর ইশারা ও সহযোগিতা। সেই 'সময়' ও 'আহ্বান'কে যথাযথ কাজে লাগিয়ে, 'ইচ্ছা'কে বাস্তবায়িত করতে হয়। কালকূটের ভ্রমণাঙ্গে, বনভ্রমণের ইচ্ছা অনেকদিন ধরেই প্রবল ছিল। কিন্তু তখনও অরণ্যের হাতছানি তেমন করে নজর কাড়েনি। কিন্তু যে-সময়ে তিনি সেই আহ্বান পেলেন, তখনই স্বগতোক্তির স্বীকারে 'মন চল বনে' এই কথা শুনিয়ে যাত্রা করলেন বনভ্রমণের উদ্দেশ্যে।''[৫১]

সমরেশ বসু-র দ্বিতীয় লেখক-সত্তা কালকূট। বিভিন্ন চিত্রপট, অফুরন্ত মানুষজন, বহুধাবিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ইত্যাদি বিচিত্রতার পিপাসায় অনবরত পর্যটনরত তাঁর এই দ্বিতীয় লেখক-সত্তা। এক দার্শনিকের দেখার চোখে সবকিছু দেখে যাওয়া, ছুঁতে গিয়েও পাশ কাটিয়ে দৃশ্যান্তরে চলে যাওয়া এবং সর্বোপরি এক প্রগাঢ় নির্লিপ্ততা কালকূট-কে ভিন্ন আসনে বসিয়েছে। 'দুই অরণ্য'-এর মতো তীব্রভাবে অরণ্যে মিশে যাবার প্রচেষ্টা এখানে নেই, আছে অনাদি বিস্ময় - মুগ্ধ আকুলতা আর অপার

অরণ্যপ্রেম। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তিন বছরের মধ্যে অরণ্যনির্ভর তিনখানা উপন্যাস প্রকাশ পায় কালকূট-এর কলমে - 'মন চল বনে', 'বনের সঙ্গে খেলা' এবং 'প্রেম নামে বন'। এই তিনটি উপন্যাস কিন্তু পরস্পর-বিচ্ছিন্ন পটভূমিকায় লেখা নয়, বরঞ্চ একই বন-ভ্রমণের মুগ্ধ অভিজ্ঞতার নির্মল ফসল। 'দুই অরণ্য'-এর ভৌগোলিক আরণ্যক এলাকাগুলিই এই উপন্যাসত্রয়ে অন্য আঙ্গিকে এসেছে। বাংলা সাহিত্যে একই লেখকের কলমে অরণ্য নিয়ে এমন নিরীক্ষা আর হয়নি। অথচ শৈলী, ভাষা ইত্যাদির দিক দিয়ে কালকূটের উপন্যাস তিনটি 'দুই অরণ্য'-এর থেকে একদমই আলাদা।

বিহার ও ওড়িশার সীমান্ত অঞ্চল জরাইকেলার পটভূমিকাতে লেখা প্রথম উপন্যাস 'মন চল বনে'। কালকূট অরণ্য-ছোঁয়া এই অঞ্চলে চললেন জনৈক কবি-বন্ধুর বাড়ীতে। - 'কবি-বন্ধুর ভাই গোপাল ও নিতাই-এর সহযোগিতায় লেখকের সঙ্গে জরাইকেলাতেই আলাপ হয় মোহনবাবু ও অজিত সিংজী-র সঙ্গে। সিংজী ধনী, অভিজাত ও স্বনামধন্য, বনের ইজারাদার। মোহনবাবুও একই বনের আরেকজন ঠিকাদার। লেখক, সিংজী-র আনুকুল্যে ও আতিথেয়তায় বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ভ্রমণের সুযোগ লাভ করেন। এবং স্থির হয়, সিংজীর নির্দেশেই মোহনবাবু, বদরিকাপ্রসাদ(ফরেস্ট রেঞ্জার) এবং স্বয়ং সিংজী, লেখককে বনভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেবেন এবং সঙ্গদান করবেন। বনাঞ্চলের নাম, সুবিস্তৃত সারেন্ডা রেঞ্জ। সেই সুবিশাল সারেন্ডা রেঞ্জের কিছু অংশ লেখক পরিভ্রমণ করবেন। জরাইকেলা থেকে বনপথে ছোটনাগরা পর্যন্ত স্থানে লেখকের বনভ্রমণের চারদিন 'মন চল বনে'র বিষয়বস্তু। পঞ্চম দিন থেকে বনপথে এদেলবা গ্রাম পর্যন্ত ভ্রমণ ও অবস্থানসহ ষষ্ঠদিনের বেলা দুটো পর্যন্ত প্রায় দুদিনের ঘটনাবিন্যাস 'বনের সঙ্গে খেলা'র বিষয়বস্তু। ষষ্ঠদিনের বেলা দুটোর পর থেকে, স্বয়ং সিংজীর সঙ্গে বনপথে থলকোবাদ বনবাংলো পর্যন্ত সপ্তম-অষ্টম দিনব্যাপি 'প্রেম নামে বন'-এর কাহিনী বিধৃত। এবং নবম দিনে থলকোবাদ বাংলো থেকে ফেরার পালা - একই পথে এদেলবা-ছোটনাগরা হয়ে তারপর পথ পরিবর্তণ করে কলকাতার অভিমুখে। ফেরার পথে আর তিনি জরাইকেলার দিকে আসেননি। এই মোট একটানা ন-দিনের বনভ্রমণের প্রতিপাদ্য ঘটনাবলীই লেখকের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামের গ্রন্থে বিন্যস্ত

হয়েছে। জরাইকেলা থেকে থলকোবাদ পর্যন্ত, বিচিত্রের পিপাসায় আরণ্যক কালকূটের অরণ্য-ভ্রমণ....।''[৫২]

কালকূটের রচনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উপন্যাসের প্রকরণের সাথে ভ্রমণকাহিনীর ধারাকে মিলিয়ে দেওয়া। 'মন চল বনে' কালকূট প্রকাশ করেছেন স্নিগ্ধ সুন্দর প্রাথমিক আরণ্যক-অভিজ্ঞতাকে। অচেনার চোখ দিয়ে গভীর ঔৎসুক্যে অরণ্যকে দেখার চেষ্টা করেছেন । তাঁর ভাষায় - ''এই বনের সংসারে আমি এক নবজাতক।''[৫৩] দ্বিতীয় উপন্যাস 'বনের সঙ্গে খেলা'তে তিনি যেন যৌবনমদে মত্ত, অখন্ড অরণ্য-সত্তার মধ্যে মিশে যেতে চেয়েছেন। অরণ্য ও আরণ্যক মানুষের সঙ্গে এক আদিম খেলায় মেতে উঠতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায় - ''বনের ডাকে এসেছি বনের সঙ্গে খেলতে। এই খেলাটা কী ? বনের খেলার সঙ্গে, বনবালার এই খেলাটাও অঙ্গাঙ্গী ? কোথায় নিয়ে যেতে চায় সে আমাকে, কত দূরে। ওকি ওদেরই সাতবহিনির কেউ নাকি ?''[৫৪] অরণ্য-আদিমতার সঙ্গে এই খেলার হাত ধরেই তিনি বনের অফুরান প্রেমে পড়েছেন। অরণ্যপ্রেম ও অরণ্যনারীর প্রেম তাঁর কাছে একাকার হয়ে গেছে। তারই ফসল 'প্রেম নামে বন'।

নাগরিক এক লেখক চলেছেন অরণ্যের টানে। কেন চলেছেন ? কালকূট নিজেই বলেছেন - ''কিন্তু মন যে বলে তপস্যারই থান হল বন। অতএব,চল, বনের তীর্থক্ষেত্রে।''[৫৫] চিরাচরিত ভারতীয় বোধ যেন কাজ করে, বাণপ্রস্থ জীবন অরণ্যে যাপনের সেই আকুলতা অন্তরে বুঝি নাড়া দেয়।

অরণ্যের তীর্থময়তার আভাস হয়তো তাঁর মনে ছিল বিভূতিভূষণের লেখার অনুপ্রেরণায় এবং কিছুটা কল্পনায়। তাঁর এর আগের যে ব্যক্তিগত অরণ্যভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল তা কিন্তু অন্যরকম - ''বন বললেই সুন্দরবনের কথা মনে পড়ে যায়। সে এক চোখ জুড়ানো, লবনাক্ত জলরাশির ঢেউ-লাঞ্ছিত বনকূল। চোখে স্বপ্নের মায়া লেগে যায়। অথচ শিরদাঁড়ার কাছে কেমন একটা কাঁপন লেগে থাকে। প্রাণভোলানো সৌন্দর্য্যের সঙ্গে, মৃত্যু ফেরে পায়ে পায়ে, তার নাম সুন্দরবন। তোমাকে কেউ বলে দেবে না। বুঝিয়ে দেবে না। পারাপারহীন রায়মঙ্গলের কূলে, বেলাশেষে যখন নৌকার ছইয়ের ওপর বসে থাকবে, আর দূরে সেই বিশাল অজগরের মতো নদীর বুকে আঁকেবাঁকে যে দুলছিল, সে আস্তে আস্তে শত শত বালিহাঁসের রূপ ধরে আকাশে

উড়বে, হারিয়ে যাবে বনাঞ্চলের ছায়ায়, তখন জলে জলে সর্বত্র রূপের অধিক, আরো কিছু তোমার মনের মধ্যে শিরশির করে উঠবে। অথচ কিছু ব্যাখ্যা করতে পারবে না। কী যেন আছে সেই লবনাক্ত গভীর জলের স্রোতে, আকাশের গাম্ভীর্যে, রহস্যঘন বনে। কেন যেন মনে হবে, বনের দূরান্ত ভূমি, ফাঁকা, যতদূরে চোখ যায়, চিকচিক করছে। কিন্তু ছায়ানিবিড়, মাথা ঢাকা বনের জটা, সূর্যকেই মাথা কুটে তপস্যা করতে হয় সেখানে হাজিরা দেবার জন্য।''[৭৬]

সেই অজানা রহস্যনিবিড় বনকে কালকূট এবার ছুঁতে চেয়েছেন নির্ভয়ে। রেলগাড়িতেই সেই আবহ অনেকটা রচনা হয়ে যায়। অরণ্য-আশ্রিত নাগরিক মানুষজন এবং অরণ্য-নির্যাসে তৈরী আদিবাসী মানুষদের মাঝখানে বসে কালকূট আত্মীয়তা বোধ করছেন। বুঝতে পারছেন এবারের অরণ্যভ্রমণ তাঁকে অন্য স্বাদ এনে দেবে। বনবাসীদের নিস্পাপ সারল্য তাঁকে মুগ্ধ করছে। আর জানালার বাইরে চোখ গেলেই দেখতে পাচ্ছেন -

''ক্রমে প্রকৃতি নয়নভোলানো হচ্ছে। বনের নিবিড়তা বাড়ছে। সব থেকে যা অবাক করছে, তা হল রঙ। এত বর্ণ, কোনো বনে কি আর দেখেছি ! নাম জানিনা গাছের, নাম জানিনা ফুলের। ক্ষতি নেই। কিন্তু এ মৃত্তিকার রসের ধারায় এ কি জাদু, যেন রঙের ইন্দ্রজাল দেখাচ্ছে !''[৭৭]

''গাড়ি চলেছে যেন নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে বনবাসী মেয়েপুরুষদের দেখতে পাচ্ছি। বনের গভীরে তারা চলেছে, কোথাওবা দল বেঁধে কী সব কাজে যেন ব্যস্ত। থেকে থেকে বনের ছায়ায়, হঠাৎ যেন কী চিকচিক করে উঠছে। নদী নাকি ? দ্রুত ধাববান গাড়ির সঙ্গে, নজর বেঁধে রাখতে পারিনা। মনে হয়, চোখের তারা হারিয়ে যায়। ছবিটা আঁকা হয়ে থাকে মনের কোণে।''[৭৮]

রেলকামরার মধ্যেই 'গাঙ্গুলীমশাই'-এর সঙ্গে পরিচয়। আপাত সাধারণ এই মানুষটির মধ্যে এক গভীর অরণ্যপ্রেমিক বাস করেন। বনের প্রাক্তন এই ইজারাদার অরণ্যকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে চিনেছেন। রুক্ষ চেহারার এই মানুষটির অভ্যন্তরে কী গভীর অরণ্যপ্রেম। তাঁর স্মৃতিতে এখনো ধরা পড়ে আছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উজ্জ্বল সান্নিধ্য, 'জরাইকেলায় তাঁর বাড়ীতে বিভূতিভূষণ এসেছেন, খাওয়াদাওয়া

করেছেন, দাওয়ায় বসে কত গল্প বলেছেন।''[৫৯] কালকূট মুগ্ধ বিস্ময়ে শোনেন অরণ্যপ্রেমিক বিভূতিভূষণ সম্পর্কে গাঙ্গুলীমশাই-এরস্মৃতিচারণ ঃ

ক)''বাঁড়ুজ্যেমশাই মানুষটিও যে বড় ভাল প্রাণখোলা ঋষির মতো মানুষ। আমাদের বাড়ীর পেছনে, উঁচু টিলাটার দিকে তাকিয়ে কী যে দেখতে পেতেন, কে জানে। তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। মনে হত যেন, সেই টিলার ওপরে কোনো দেবতাকে দেখতে পেয়েছেন।''[৬০]

খ)''গোটা সারেন্ডা বনটা যে আতিপাতি করে দেখেছেন। অমন বন-পাগল মানুষ দেখিনি। কী বলব বাবা আপনাকে, মায়েদের দেখেছেন তো ছেলে কোলে করে, তার গোটা শরীরটা আতিপাতি করে দেখে, কোথায় একটা তিল, কোথায় একটা জরুল, কোথায় একটা ফুসকুড়ি, দেখতে দেখতে মায়েদের দেখেন না, কেমন যেন ওনাদের চোখ জুড়িয়ে যায়, বিভূতিবাবুর কাছে বন ছিল সেইরকমের। সব একেবারে হাত দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন।''[৬১]

যাঁর পদচিহ্ন ধরে তিনি বনে এসেছেন তাঁর সম্পর্কে এত কথা শুনে লেখকের 'গায়ে যেন কাঁটা দেয়।' তিনি তাঁর অরণ্যপর্যটনের পথ আরো পরিষ্কারভাবে খুঁজে পান - ''আমিও যাবো সেই গভীর সারেন্ডা বনের পথে পথে, ছায়ায় ছায়ায়, ঝর্ণার ধারে, পাহাড়ী নদীর কূলে কূলে।''[৬২] এভাবেই একটি অরণ্য-আখ্যানের পটভূমি রচিত হয়ে গেল। আর এই অরণ্যচেতনা ক্রম-উদ্ভাসিত করতে একে একে এলো অরণ্যছোঁয়া নানান চরিত্র। যার হাত ধরে লেখকের মধ্যে অরণ্যটান আরো নিবিড় হল, সে গাঙ্গুলীমশাই-এর কিশোরী বা তরুণী কন্যা তিপু। পুরো আরণ্যক নয়, অথচ অরণ্যের সরলতা যার চোখে মুখে, আচরণে। বনের সরল সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করার নেশা যেন তিপু-ই বাড়িয়ে দেয়। যার উজ্জ্বল সান্নিধ্যে তিনি চললেন কোয়েল নদীর কাছে। ''আরো দূরে, গভীর বন এবং পাহাড়, যার ভিতর থেকে কোয়েল নেমে আসছে, একটা বাঁকের মুখ থেকে। আকাশ এত বড়, উদার, সব মিলিয়ে, কেমন একটা গভীর গাম্ভীর্য্য রয়েছে।''[৬৩]

কোয়েল নদী ও তিপুর সঙ্গে কোথাও যেন একটা ভীষণ মিল রয়েছে। যে কোয়েল প্রথম দর্শনে লেখক দেখছেন সে অরণ্যের বাইরে প্রবহমান, এবং তিপু, গাঙ্গুলীমশাই

প্রমুখ প্রথম পরিচয়ের মানুষগুলোও অরণ্যের ঠিক বাইরেই রয়েছেন। অথচ নদীটাও যেমন অরণ্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়িয়ে দিচ্ছে, তিপু-গাঙ্গুলীমশাই তেমনি আরণ্যক টান তীব্রতর করতে একটা অলক্ষ্য ভূমিকা নিয়েছে। বিশেষতঃ অরণ্যের প্রতি এই ক্রমবর্ধমান আকুতিতে তিপু একটা নম্র রোমান্টিকতা যোগ করেছে। অসমবয়সী এই নারী অরণ্যপটভূমিকায় লেখককে যেন অরণ্যের প্রথম পাঠ শেখাচ্ছে উচ্ছল কোয়েলের তীরে। কখনো লেখককে শেখাচ্ছে 'মান্ডি মানে ভাত, ডিয়েং মানে হাঁড়িয়া'[৬৫], অপরিচিত গাছ দেখিয়ে বলছে 'এটা হল ধ, এটা করম,'[৬৬] এক প্রায় উলঙ্গ আধ-বুড়োকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে 'সোনাখোঁচা' কাদের বলে - ''ওরা জানে নদীর জলের ধারে ধারে কোথায় বালিতে সোনা আছে। সেখানে ওরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বালি তোলে।''[৬৭] বনবালার শাড়ি দেখিয়ে ব্যাখ্যা করছে - ''ওগুলোকে বলে কিচরি। ওদের তাঁতীরা নিজেরা বোনে, ওরাই শুধু পরে।''[৬৮] এই কিশোরীর সান্নিধ্যে অসমবয়সী লেখকের অবচেতনেও যেন এক আরণ্যক তৃষ্ণা জন্মাচ্ছে। তিনি উপলব্ধি করছেন - এ সরলতা অরণ্যেরই অলঙ্কার। কিন্তু আরণ্যক নদীর অকপট সান্নিধ্য তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তোলে এক প্রগাঢ় নির্লিপ্তি, কিশোরীর প্রতি মোহ থেকে উত্তরণ ঘটে আরো গভীরে, কিংবা আরণ্যক উচ্চতায় -

''কোয়েলের তীরে একটু একলা থাকতে ইচ্ছে করছে, চরের বুকে একটা পাথরের ওপরে। ধ্যান করবো না, সে মন পেয়েছি আর কবে। তবু এই ছায়া ঘনিয়ে আসা চর, ওপারের পাহাড়ের মাথায় আকাশে লেগেছে রক্তাভা, এবং ক্রমে বন নিবিড়তর। কোয়েলের কলকল ধ্বনি, দূরে গাছে পাখিদের কলরব, আর একেবারে নির্জন বালুরেখা। এখানে চুপ করে একটু বসে থাকতে ইচ্ছা করছে।...কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে যে মুনি-ঋষিদের কথা, যাঁরা তপস্যা করেছেন এমনি নিবিড় বনের ছায়ায়, সে রকম তপস্যা আমার কিছু নেই। যে জীবনটা কাটাই, বারো মাস যা নিয়ে থাকি, মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠে, সে-ই সব সত্য না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে, এই বনের হাতায়, অসীম আকাশের তলায়, একবার নিজেকেই দেখতে ইচ্ছা করে। যে-আমি, আমাকে ছেড়ে উদাস হয়ে বেড়ায়।''[৬৯]

এই উচ্চারণের সাথে সাথে কালকূটের অরণ্য-পর্যটন অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। সমরেশ বসু-র থেকে যা অনেকটাই ভিন্ন। অরণ্য যেন দর্পণ হয়ে ওঠে, যেখানে অস্থির

নাগরিক-মন তার ভেতরের লুকোনো ছবিটা দেখতে চায়। অরণ্য-আবিষ্কারের বদলে এ যেন অহম-আবিষ্কারের স্তরে উন্নীত হয়। বহু ফাঁকিতে ভরা জীবনে অরণ্য সুযোগ করে দিচ্ছে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার। এক বিশাল ব্যাপ্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আপন সত্তাকে যাচাই করে নেওয়া। কালকূটের অরণ্যসাহিত্য এখানেই অনন্যতা পেয়ে যায়।

শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী লিখেছেন - ''তিপু-র ভূমিকা, গভীর বন-প্রবেশের তোরণ হিসাবেই দ্যোতিত হয়েছে। যে তোরণের চিত্রে যুবতী-সুলভ নিষিদ্ধ বোধ জাগ্রত হয়নি। হাট-করা সরলতায় কিশোরীর সহজ স্বভাবের মন ও আচরণ উন্মোচিত হয়েছে মাত্র।''[৯] আর গাঙ্গুলীমশাই লেখককে অনুভব করিয়েছেন অরণ্য জীবন ও মননকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে। একদা নিজেকে জীবিকার তাগিদে ইজারাদারি করতে হলেও তিনি হাড়ে হাড়ে জেনেছেন - ''চোর না, ডাকাত না হলে হয় না। ডাকাতি করতে পারলে ইজারাদারি চলে। কর্তাদের ঘুষ খাওয়ান, আর বেআইনি চুরি করে গাছ কাটেন। যায় যাবে, সরকারের যাবে, আপনি নিজের কোলটি ভরেন। সৎপথে ইজারাদারি চলে না।''[১০]

গাছ-কাটা তাকে তীব্রভাবে পীড়িত করে। এই গাঙ্গুলীমশাই-এর মধ্য দিয়ে কালকূট অরণ্যকে একটা জীবন্ত সত্তায় উন্নীত করেছেন। বৃক্ষরাজির সঙ্গে মানবসত্তাকে অভিন্ন করে দেখেছেন। অরণ্য-নিধন সম্পর্কে তাই গাঙ্গুলীমশাই আক্ষেপ করে বলেন - ''মহাপাতকের কাজ তো। প্রাণীহত্যার দায় যাবে কোথায় ? বনের ইজারাদারদের বংশ কখনো সুখী হয় না। ...গাছ তো প্রাণী। আপনি খাট আলমারি নিয়ে ভোগ করেন, সেটা আলাদা। কিন্তু যে তারে মেরে খায়, তার অভিশাপ লাগবেই। খুন হওয়ার কষ্ট সকলের সমান।''[১১] গাঙ্গুলীমশাই-এর এই অসাধারণ উপলব্ধির কথা শুনে লেখক স্পন্দিত হন, শিহরিত হন। - ''মুহূর্তের মধ্যেই যেন সমস্ত বনভূমি আমার চোখে নতুন রূপে জেগে উঠল। গাছেরও প্রাণ আছে, এমন কথা জানা ছিল। কিন্তু সেই প্রাণের মর্ম জানা ছিল না। সে যে নিহত হয়, কষ্ট পায়, অভিশাপ দেয়, এমন করে কথাটা কোনোদিন মনেও আসেনি। কিন্তু সত্যি কি গাছের অভিশাপ মানুষের লাগে ?''[১২] গাঙ্গুলীমশাই একদা গাছ কাটার জন্য এখন তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি - ''কম করি আর বেশি করি, পাপ তো আমিও করেছি। তাই মনে হলেই মধুসূদনকে ডাকি, ত্রান করো হে, ত্রান করো।''[১৩] একজন ইজারাদারের

এই আত্মঅনুশোচনা একটা বিরল ঘটনা। বাংলা উপন্যাসের পথদর্শনে যা অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। মনে পড়ে যায় বিভূতিভূষণের সত্যচরণের অনুভূতির কথা, গাঙ্গুলীমশাই যেন সত্যচরণের উত্তরাধিকারকে বহন করেন এই অনুশোচনার মধ্য দিয়ে।

গাঙ্গুলীমশাই-এর বাড়ীতে অরণ্যতপস্বী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একদা আগমনটাকে আরোপিত বা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় না - কারণ তাঁর ভ্রমণরচনা 'বনে পাহাড়ে' ও 'খলকোবাদে একদিন'-এ এই এলাকায় পর্যটনের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই। ওখানকার বহু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। 'সারান্ডা অরণ্যে ভ্রমণের সময় বিভূতিভূষণ বনগ্রামবাসী জনৈক মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্রাকারে তাঁর একটি ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা লিখে পাঠান, যা পরে 'পল্লীবার্তা' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয়।'[১৪] বিভূতিভূষণ লিখছেন -''...কালও সন্ধ্যার অন্ধকারে অরণ্যপথে বেড়াবার সময় ভাবছিলুম এতক্ষণ দূর বনগ্রামের একটি ছোট্ট ঘরে আপনারা বসে গল্পগুজব করছেন। যতীনদা এসে সকলকে হাসাচ্ছেন, আপনি ঘনঘন তামাক সাজছেন, শিবেনদা চুপ করে বসে আছেন, বিনয়দা গল্প করচেন, সুবোধদা কত সস্তায় মাছ কিনেচেন সেই গল্প করচেন, জয়কৃষ্ণবাবু তামাক খাচ্ছেন, হরিদা এত রাত্রে নেই, ঠান্ডার ভয়ে বিকেলেই বাড়ী চলে গিয়েচেন, মনোজবাবু বোধহয় আজকাল আসে না, মিতেও আসে না - কন্ট্রাকটারী নিয়ে ব্যস্ত। বেশ লাগে ভাবতে এত দূর থেকে - মনে হয় ওরাই আমার সব আপন লোক, কতদিনের নিবিড় পরিচয়ের প্রিয় সাথীবৃন্দ, কত ভালবাসি সকলকেই।''[১৫]
এই প্রিয় মানুষগুলোর মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছেন কালকূট-বর্ণিত 'গাঙ্গুলীমশাই'ও।

'দুই অরণ্য'-এর আলফ্রেডের মতোই 'মন চল বনে'-তে রয়েছে এক 'খাস বিলেতি সাহেব, এক সময়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিরাট অফিসার ছিলেন।'[১৬] যিনি ইওরোপীয় জীবনযাত্রা অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে প্রায় পুরোপুরি মুন্ডা হয়ে গেছেন। আলফ্রেডের মতোই পুনর্বিবাহ করেছেন এক মুন্ডা আরণ্যক রমণীকে, যার নাম 'সুনি'। উল্লেখ্য আলফ্রেডের বৌ-এর নামও 'সুনি'। 'মন চল বনে'র উইলিয়াম সাহেব আর 'দুই অরণ্য'-এর আলফ্রেড সাহেবকে একই মানুষ বলে মনে হয়। তবে 'দুই অরণ্য'-এ আলফ্রেড যতটা জায়গা জুড়ে আছেন তাঁর দর্শন, জীবনযাত্রা দিয়ে,

আলোচ্য উপন্যাসে তা নয়। তবে উইলিয়াম সাহেবের বন-প্রেম, তার জীবনকাহিনী কালকূটকে অরণ্যের প্রতি আরো মোহাবিষ্ট করে।

এই মোহ নিয়েই এবার অরণ্যের গভীরে যাবার পালা। দুটো দিন অরণ্য-ছোঁয়া গ্রাম একটা অব্যর্থ আবহ তৈরী করেছিল। তৃতীয় দিন সকালে বনের গভীর পথে লরিতে চড়ে তাঁর যাত্রা শুরু হল। এখানে একটা **irony** রয়েছে। গাঙ্গুলীমশাই যে ইজারাদারের অরণ্যনিধনের লিপ্সা সম্পর্কে তাঁর মনে বীতশ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছিলেন, অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে তাদের সাহায্য তাঁকে নিতে হল। যাদের সঙ্গে তিনি অরণ্যে চলেছেন তাদের উদ্দেশ্য গাছ কাটা।এই হত্যালীলার সঙ্গী হয়েও লেখকের নির্লিপ্ততা তাঁকে তাদের থেকে আলাদা করেই রাখলো। তাঁর উদ্দেশ্য ছোটনাগরা, এদেলবা,থলকোবাদ প্রভৃতি অরণ্যগভীর অঞ্চলের মন ছুঁয়ে দেখা। নোয়াডিহির পাহাড়ী জঙ্গলে উঠতে উঠতে -

''অন্ধকার যেন আমাদের গ্রাস করল। মাথার ওপরে প্রখম ফাল্গুনের রোদ। কিন্তু ঠান্ডার স্পর্শ তাতে। গভীর বনের অন্ধকারে বাতাস নেই, ঠান্ডা বেশী। লরির গর্জন একটু আগেও, বিরল বনপাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলছিল, এখন আর তা নেই। বন তাকে গ্রাস করেছে। আর কুলুকুলু শব্দ যেন আমাদের সবসময়েই অনুসরণ করে চলেছে।''[১৬] কোয়েলের শাখানদী কোয়েনা আর নিশ্ছিদ্র বনের সান্নিধ্যে শুরু হয় উপন্যাসের মূল বন-পর্ব। অনভ্যস্ত চোখে অরণ্য দিচ্ছে অপার বিস্ময়। বনমোরগের আকস্মিক লাফ, পাহাড়ের গায়ে হাতিদের গা চুলকোনোর আয়নার মতো লাল জায়গা- যেন রক্তাক্ত মাংস, আরণ্যক যুবতীদের গান ইত্যাদি অরণ্যকে বাঙ্ময় ও পূর্ণতর করে তুলতে লাগলো। আরণ্যক ফুল দেখে লেখকের অনুভূতি -

''জরাইকেলায় দু-একটি কুসুম গাছ দেখে, রক্ত মাতাল হয়েছিল। এখন এই বনের গভীরে, কোথাও কোথাও কেবল রক্তকুসুম। মনে হয়, জগৎসংসার সব লাল হয়ে গিয়েছে।''[১৭]

বনপরিবেশে বন-মানবমানবীর সান্নিধ্যে অরণ্যচারণ সঠিক মাত্রা পেয়ে যায়। মোহনবাবুর বনের ইজারাদারিতে গাছকাটার আদিবাসী শ্রমিক শুক্রম, তার বৌ সোমারি, শ্যালিকা সুরসতিয়া। বনের স্বরূপ বুঝতে এদের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী ছিল।

তিপুর সারল্যমাখা সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা বনের বাইরের আদলটা তৈরী করে দিয়েছিল, আর সুরসতিয়ার সামান্য একটু কাপড়ের আবরনে 'উদ্ধত শরীর'[১৮] উচ্ছল হাসিগান পুরো বুনো আবেদন বয়ে আনলো। লেখকের দিকে তাকিয়ে সুরসতিয়া যে আরণ্যক গান গাইল তার অর্থ - 'মানুষটার মন বড় দরাজ। আমি চাইলে বোধহয় একটা পুরো পাহাড় দিয়ে দেবে। মানুষটার মন বেশ ভাল।'[১৯] এখানে অন্য অর্থ নেমে আসে - আরণ্যক মানুষ উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষায় নাগরিক হৃদয়কে ছুঁতে চাইছে। সুরসতিয়ার ডাগর কালো চোখের মোহময় দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তাই লেখকের মনে হচ্ছে - ''সুরসতিয়া কি আমাকে ওদের আদিম মন্ত্রে মুগ্ধ করছে ? উইলিয়াম কি এমনি চোখের টানেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন ?সুরসতিয়া যেন এই গভীর বনের এক উল্লাস আমার মনে ছড়িয়ে দিচ্ছে।''[২০] উপন্যাসটিতে অরণ্য তার বুনো গন্ধে প্রবেশ করে। সুরসতিয়ার প্রতি আভ্যন্তরীন কামনা আসলে প্রতীকী অর্থে অরণ্যকে কামনা করার ইঙ্গিত দেয়। তিপু দিয়েছিল স্নিগ্ধতা,সুরসতিয়া দিল আরণ্যক আদিমতা। কিন্তু সে আদিমতা গভীরে দানা বাঁধবার আগেই সুরসতিয়া, সোমারি, শুক্রম-দের নিয়ে মোহনবাবু এদেলবার দিকে চলে গেলেন। অরণ্য তো প্রকৃতি, প্রকৃতি তো আসলে নারী। তাই কালকূটের উপন্যাসের মূল পর্ব জুড়ে বিভিন্ন নারীর আনাগোনা। বনগ্রাম ছোটনাগরায় নেমে লেখক অরণ্য-সান্নিধ্যকে অনুভব করতে বেরোলেন। অরণ্যবস্তি ছাড়িয়ে নির্জনতায় চললেন। আর সেই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা সারেন্ডাখন্ডের ছোটনাগরা বনাঞ্চলের হেলথ সেন্টারের নার্স তৃপ্তি ভৌমিকের। দেখাটাও খুবই আকস্মিক - ''ফিরে, বনের দিকে তাকাতে গিয়ে , থমকে গেলাম। বলতে গেলে, প্রায় একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য আমার সামনে। একটি বাইশ তেইশ বছরের মেয়ে। ফরসা রঙ, খানিকটা মাজা মাজা বলা যায়। চোখদুটি ভাসা ভাসা, কালো ডাগর। একটি লালপেড়ে মিলের পাতলা শাড়ি, কুঁচিয়ে ফেরতা দিয়ে পরা। যাকে বলে নাগরিকা পরিধান।''[২১] সুরসতিয়া যখন আরণ্যক উন্মাদনা জাগিয়ে গেল, তখন এই নাগরিক-নারীর অবতারণা প্রথমে অস্বাভাবিক মনে হয়। লেখকের ভাবনাও এ-মুহূর্তে একটু অস্বাভাবিক। তাই তাঁর কপালকুন্ডলার কথা মনে পড়ে যায়। 'আপনি কি বাঙালী ?'-তৃপ্তি ভৌমিকের এই প্রশ্ন শুনে তাঁর মনে হচ্ছে কপালকুন্ডলা তাঁকে শুধোচ্ছে - 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?'[২২] চারিদিকের নি:ঝুম আরণ্যক পরিবেশই তাঁকে নবকুমারে রূপান্তরিত করেছে। তৃপ্তি ভৌমিকের কাছে অরণ্যবাস

অনেকটাই নির্বাসনের মতো। ট্রান্সফারের জন্য বহুবার বলেও পাওয়া যায় নি। তৃপ্তি অরণ্যে রয়েছেন তাঁর পরিবার সচল রাখতে,কর্তব্যের টানে। লেখকের ভাষায় - ''তৃপ্তি এই গভীর জঙ্গল থেকে, দমদমের জীবনস্রোতকে বহমান রাখছে।''[৮৩] অরণ্যপটভূমিকায় এই নাগরিক-রমণী এনে দেন এক অন্য ধরণের শুদ্ধতা। তিপু যে সরল উচ্ছ্বাসে অরণ্য দেখিয়েছে, তৃপ্তি তা নয়। তাঁর মধ্যে বয়স ও অভিজ্ঞতার স্থিতি। তিনিও বিখ্যাত অতিথিকে অরণ্য ও আরণ্যক মানুষজন চেনান, তাঁর মতো করে। আরণ্যক মানুষেরা আধুনিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত, কখনো বা নিজেরাই সন্দিগ্ধ। তৃপ্তির মুখে তাই শোনা যায় - ''ওষুধপত্র সেরকম কিছু নেই। এখানকার লোকেরাও ওষুধবিষুধ খেতে চায় না। ইনজেকশন তো বাঘ। জ্বর জ্বালা হলে একটু মিকশ্চার দিই।''[৮৪] অরণ্যের এক অদ্ভুত জ্বরের কথাও তাঁর কাছ থেকে জানা যায় - ''আর এত ফুল, তার একটা রিঅ্যাকশন হয়। শরীরে উত্তাপ বাড়ে। রীতিমতো একশো দুই-তিন জ্বর উঠে যায়।''[৮৫] তৃপ্তি তাঁকে বহু আরণ্যক শব্দ-এর অর্থ শেখান।আরণ্যক রীতি-সংস্কার-অভ্যেস সম্পর্কে অনেক কিছু জানান -'' মেয়ে-মদ্দ সবাই বড় হাঁড়িয়া খায়। খাবেই। আগে হাঁড়িয়া, তারপরে ভাত। চাল যদি কম থাকে, তবে ভাত আর রাঁধে না। হাঁড়িয়া বানিয়ে ফেলবে, তাই খেয়ে থাকবে। তবে হাঁড়িয়া খেলে পেটও ভরে, নেশাও হয়।''[৮৬] তিপু তাঁকে নিয়ে গেছে কোয়েলের উচ্ছলতায়, আর তৃপ্তি নিয়ে যায় 'তারা-মাচা' বা High view finder থেকে অরণ্যের গম্ভীর রূপ দেখার জন্য -''একেবারে উঁচুতে উঠে, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে মনে হল, পৃথিবী ছাড়িয়ে যেন কোন এক দূর জগতে চলে এসেছি। যেদিকে তাকাই, নানা বর্ণের সমারোহ। তার মধ্যে নীল আর সাদাই বেশী। বনকে নীল দেখায়। সবুজেরও যে কত বর্ণবাহার, না দেখলে বোঝা যায় না।''[৮৭] ছোটনাগরায় তৈরী হল অরণ্যের সঙ্গে তৃপ্তির প্রতিও আকর্ষণ। তৃপ্তিও তো প্রকৃতি। কিন্তু কালকূট তো থেমে থাকার জন্য আসেননি। তাই আরো গভীরে এদেলবা-য় যাবার জন্য তৈরী হলেন। তৃপ্তি তাঁর সঙ্গ নিতে চাইলেন -''এদেলবার জঙ্গল আপনাকে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো।''[৮৮] কিন্তু এক মুন্ডা বউ-এর প্রসব ব্যথার কারণে সেবিকা তৃপ্তি যেতে পারলেন না। এই না-যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এদেলবায় আরণ্যক নারী সুরসতিয়াকে ঘিরে এক আদিম আরণ্যক কাহিনী যে অপেক্ষা করে আছে, যা তৈরী করে দেবে দ্বিতীয় উপন্যাস 'বনের সঙ্গে খেলা'র মাদকতাময় পটভূমি। তাই নাগরিকা তৃপ্তি ভৌমিকের

অনুপস্থিতি একান্ত কাঙ্ক্ষিত। তাই উপন্যাস শেষে আমরা দেখি ''তৃপ্তি রক্তকুসুমের রক্তাভায় দাঁড়িয়ে। ধুলো উড়িয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।....জীপ বাঁক নিয়ে গভীর বনের চড়াইতে উঠতে লাগল।''[১৯]

অরণ্যের উপকণ্ঠ থেকে কালকূট এবার চললেন অরণ্য-গভীরে, পঞ্চমদিনের দ্বিপ্রহরে। 'মন চল বনে'র নিজস্ব আহ্বান প্রগাঢ় আরণ্যক ছায়া পায় দ্বিতীয় উপন্যাস 'বনের সঙ্গে খেলা'তে। আরণ্যক আদিমতার সঙ্গে এক অতীন্দ্রিয় চেতনার মিশেলে এক অদ্ভুত মানসিক পরিস্থিতিতে পৌঁছে যান এই উপন্যাসের মূল চরিত্র প্রথম পুরুষটি। অরণ্যনারী সুরসতিয়া তাকে নিয়ে যাবে এক আদিমতার দিকে, পাশাপাশি অপরূপ নিসর্গ তাঁর মধ্যে এনে দেয় মৌন ধ্যানী চেতনা। দুইয়ের টানাপোড়েনে সারেন্ডা অরণ্য পাঠকের কাছে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। উপন্যাস শুরুতে কালকূট লেখেন -''অরণ্য আমাকে খেলতে ডেকেছে, তার নিবিড় গভীর রূপসাগরে। খেলার নিয়মকানুন সব আমার জানা নেই। খেলতে খেলতে জানবো, জানতে জানতে খেলবো। সে আমাকে যেমন করে খেলা দেবে, আমি তেমনি করে খেলবো। খেলতে খেলতে আঘাত যদি লাগে, চোখে ছাপিয়ে আসে জল, খেলার কানুন মেনে চলবো।সেই খেলা খেলতে এসেছি, তার আগে, ঘরের খেলার দান মিটিয়ে আসতে হয়েছে। এখন বনের সঙ্গে খেলা।''[২০] স্বভাবতই লেখকের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, বনের জন্য তৈরী হয়েই তিনি এসেছেন। নাগরিক-সত্তাকে স্বপ্রচেষ্টায় দূরে রেখে তাঁর এই অরণ্য-পর্যটন। তিনি নিজে জানেন, তিনি বিবাগী বাউল না, তবু এক বাউলের একতারা সর্বদাই তাঁর শ্রবণে বাজে। তাই যখন পথে নামেন তখন সেই বাউলসত্তা প্রাধান্য পায়। কোনো বিমূর্ত্তকে ছোঁবার নেশাতেই তাঁর এই পথচলা, অরণ্যে যে খেলা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে তার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন।

বদরিকাপ্রসাদের জীপে করে তিনি পৌঁছে গেলেন আরণ্যক গ্রাম এদেলবা-য়, যার অর্থ শিমূলফুল। গ্রামের কাছাকাছি অরণ্যে মোহনবাবু সদলবলে গাছ কাটছেন, কোয়েনা নদীর তীরে পাতার ঘরে, মুন্ডা ভাষায় যা 'গুইয়ো', সবার থাকবার ব্যবস্থা। প্রকৃতি তার অকপট সৌন্দর্য্য উজাড় করে দিয়েছে এখানে। সামগ্রিক পরিবেশ কালকূটকে টেনে নিয়ে যায় কাল্পনিক পুরাণে - ''সমস্ত জায়গাটিকে অনেকটা

তপোবনের মতো লাগছে। তপোবনই বলতে হবে। তপস্বী তপস্যায় বসে গেলেই হয়। ডানদিকে, কোয়েনার ওপারে রক্তিম আর কালো পাথরের পাহাড় আকাশের দিকে মাথা তুলেছে, আর পাথরের খাঁজে খাঁজে শিকড় ছড়িয়ে উঠেছে বিশাল মহীরুহ। আরো অন্যান্য অনেক গাছ, যাদের পাতায় নানা রঙের খেলা, ফুলে নানা বর্ণের ঝলক। বন পাহাড়ে যে এত নানা বর্ণের কলকী ফুলের গাছ থাকে, আগে জানা ছিল না। কিন্তু ওপারের পাহাড়টা, আমার মুখোমুখি হঠাৎই যেন নেমে এসেছে, আর বাঁকানো পিঠের মতো একটা উপত্যকা সৃষ্টি করেছে। তার কোল দিয়ে কোয়েনা একটা বাঁকের মুখে উধাও। উঁচু পাহাড়টার কোল ঘেঁষেও, অর্ধবৃত্তাকারে কোথায় যেন কলকলিয়ে ছুট দিয়ে, কোয়েনা চলে গিয়েছে চোখের আড়ালে। আমার ইচ্ছা করে, কোয়েনার এই হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া লুকোচুরি খেলার সঙ্গে যেতে চাই। আমিও ছুটে ছুটে তাকে খুঁজে বের করি।''[৯১] নগর থেকে আসা মানুষটি মিশে যেতে চাইছেন বনের সঙ্গে। তাঁর চোখে মুগ্ধতার নীল কাজল। বনজ সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে আরণ্যক সারল্যও তাঁকে মুগ্ধ করে। সুরসতিয়াকে একটি সিগারেট দিয়ে হয়ে গেছেন মুন্ডা শ্রমিকদের প্রিয় 'সিগারেটবাবু'। একটা সামান্য সিগারেট-প্রাপ্তির আনন্দে সুরসতিয়া তার আদিবাসী ভাষায় যা গেয়ে উঠেছে তার অর্থ হল -''মানুষটার মন বড় দরাজ, আমি চাইলে বোধহয় একটা পুরো পাহাড় দিয়ে দেবে, মানুষটার মন বেশ ভাল।'' মাত্র পনেরো-বিশ টাকার 'ডিয়েং' বা হাড়িয়া পেলেই আনন্দে কৃতজ্ঞতায় বনজ মানুষগুলো সারারাত নেচে কাটিয়ে দিতে পারে। সহজ সরল সুরসতিয়া তার সুডৌল বুক নির্দ্বিধায় উন্মুক্ত করে, কোনো লজ্জা বা পাপবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে না। আরণ্যক আবাসে এক মা গাছের নীচে বসে প্রকাশ্যে সন্তানকে দুধ খাওয়ান। এই দৃশ্য লেখকের চোখে এত স্বাভাবিক ঠেকে যে, তাঁর মনে হয় -''যেন কচি ঘাসের মাঠটিতে গোবৎস চড়ে বেড়াচ্ছে।''[৯২]

কিন্তু বনের অন্দরে এসে এই যে ভালো লাগা, বনের সঙ্গে একাত্ম হবার আকূতি তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূরণ হয় না। বনের সঙ্গে খেলতে গিয়ে তার বহিরঙ্গে তিনি যতটা গ্রহণযোগ্য হন, ততটা অধিকার অর্জন করেন না বনের বাঁধনে তার অন্তরঙ্গে মিশে যেতে। তাই প্রতীকী হয়ে এসেছে ময়ূর ধরবার প্রসঙ্গ। বারবার চেষ্টা করলেন একটি ময়ূরকে ধরতে, নিদেনপক্ষে স্পর্শ করতে। 'ধরে ফেলেছি' ভেবেও দেখলেন ময়ূরটি

তার অধরাই । তাঁকে যেন জানিয়ে দেওয়া হল - বনের ছায়ার ছোঁয়া তিনি পেতে পারেন, কিন্তু বনকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করার এক্তিয়ার তাঁর নেই। তাই বলছেন -''মনে হয় যার ছায়া স্পর্শ করতে পারছি, তার গায়ে স্পর্শ করতে পারছি না। ময়ূর তো নয়, এ যেন মায়ার হরিণ। স্বর্ণ মারীচ। কয়েক মুহূর্ত্ত হতাশ চোখে অপরূপ ময়ূরটির দিকে তাকিয়ে থাকি, তারপরেই নিজের বালখিল্যতায় নিজেই হেসে উঠি। কেন মাতি এই ধরাবাঁধার খেলায় ?''[৮৩]

বন আর বন্যকে বেঁধে ফেলার যোগ্যতা বা অধিকার বা সামর্থ্য কোনটাই নেই নাগরিক-মানুষদের। কালকূট সহজেই তা মেনে নেন। 'বন্যেরা বনেই সুন্দর' এ সত্য মেনে নিয়ে তাই তিনি ময়ূর ধরবার ইচ্ছে সরিয়ে ফেলেন মন থেকে। ''আমার হাতের পাঞ্জায় , বুক চেপেও যদি আদর করি, পাখিটির সেই বন্দীদশার রূপটিই আসল না। বনে এই অঙ্গনে, এই যে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাদ্য খুঁজছে, এটাই আসল রূপ। যার যেখানে ঠাঁই। আমার নিতান্ত মানুষিক লোভ, সুন্দরকে অসুন্দরই করবে।''[৮৪]

এই উপন্যাসের মূল অরণ্যপর্বে রয়েছে সুরসতিয়া, এক মুন্ডা যুবতী, আরণ্যক রূপে, যৌবনে যে সমৃদ্ধ। 'মন চল বনে' উপন্যাসে বর্ণিত পটভূমিকায় যার সঙ্গে লেখকের প্রাথমিক পরিচয়। ঐ উপন্যাসে লেখক অরণ্যের নেশায় আচ্ছন্ন হয়েছেন দূর থেকে, তাই সুরসতিয়ার সঙ্গেও দূরত্ব থেকে গেছে। দ্বিতীয় উপন্যাসে তিনি প্রকৃতই প্রবেশ করতে চেয়েছেন অরণ্যে, তাই অবশ্যম্ভাবীভাবে চলে এসেছেন সুরসতিয়ার কাছে। অরণ্যনারী সুরসতিয়া যেন আদিম অরণ্যের প্রতিচ্ছায়া। শঙ্খনাথ চক্রবর্ত্তী তাকে নিয়ে বলেছেন,''বনবালা সুরসতিয়া তো বনের প্রকৃতি রূপের এক শরীরী প্রতীক মাত্র। যে প্রতীকের ছায়ার স্পর্শে লেখক তাঁর প্রিয় নারীর মর্যাদায় সুরসতিয়াকে মনোনীত করেও, সুনিবিড় বনের স্বকীয় রূপে সমৃদ্ধ সুরসতিয়াকে প্রকৃতপক্ষে পান নি, এবং আরণ্য-নিবিড়তাকে পাওয়া যায়ওনা।''[৮৫]

এদেলবা-পর্ব মূলতঃ সুরসতিয়া-কেন্দ্রিক। অরণ্যের এক যৌনগন্ধী টান, অনিবার্য্য আদিমতা প্রকট হয়ে ওঠে। সে তার সরল অথচ নিবিড় দৃষ্টিতে, শারীরিক যৌনতায়, এবং এক রহস্যময় ভালোবাসায় কাহিনীকারকে বিবশ করে দিতে চায়। গভীর

অরণ্যের মতোই আলো-আঁধারিতে ভরা সে, অথচ তীব্র সুন্দর। সুরসতিয়াকে এদেলবা অরণ্যে তাকে দেখে কাহিনীকারের প্রতিক্রিয়া এমন, ''...সুরসতিয়া এসে দাঁড়ালো। একটি মাটির হাঁড়ি দু-হাতে ধরা, কোলের কাছে। ধোয়া খয়েরী ডোরাকাটা শাড়িটি পরেছে অদ্ভুতভাবে। নিচের দিকে দু-ভাঁজে জড়িয়েছে, তাতে যেমন সহবত প্রকাশিত, তেমনি ওর পরিশ্রমী দৃপ্ত কোমরে যেন ডোরাগুলো লেপটে গিয়েছে।এক ভাঁজ শাড়ি টেনে দিয়েছে বুকের ওপর দিয়ে। ভেজা চুল মুছে আঁচড়েছে। কপালে একটি মেটে সিঁদুরের টিপ, যেন এই সারেন্ডা অরণ্যের মৃত্তিকারই ফোঁটা। জানিনা, ও মুখে তেল মেখেছে কীনা, কিন্তু মুখখানি দেখাচ্ছে যেন তেলতেলে। সে এসে দাঁড়িয়েছে, দৃষ্টি বিনিময় করে হাসলো। হাসির ঝিলিকটি ওর কৃষ্ণ ডাগর চোখেও। সেই কথাটাই আমার আবার মনে হলো, সুরসতিয়া যেন আমাকে অরণ্যের আদিম মন্ত্রে মুগ্ধ করে। আমি সহসা দৃষ্টি ফেরাতে ভুলে যাই।''[৯৯] অরণ্যের যে এক চিরন্তন সম্মোহনী শক্তি আছে তা সুরসতিয়ার তীব্র আবেদনের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়। মোহগ্রস্ত, নিজের অবস্থান-বিস্মৃত একটি মানুষের মতোই তাই কাহিনীকার তার দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তাই সুরসতিয়া যখন তাকে আকুলভাবে 'ডিয়েং' বা জংলী মদ খেতে অনুরোধ জানায়, তিনি আপত্তি জানাতে পারেন না। সুরসতিয়ার কাছাকাছি এবং বিস্তৃত অর্থে অরণ্যের কাছাকাছি পৌঁছতে হলে আরণ্যক অভ্যাসকে আয়ত্ত করতে হয়, তিনি তা উপলব্ধি করেন। বুঝতে পারেন, নাগরিক দ্বিধাকে না মুছলে অরণ্যের অন্দরে প্রবেশ করা যাবে না। এ এক অন্য খেলা।-''বনের ডাকে এসেছি, বনের সঙ্গে খেলতে। এই খেলাটা কী ? বনের খেলার সঙ্গে, বনবালার এই খেলাটাও কি অঙ্গাঙ্গী ? কোথায় নিয়ে যেতে চায় সে আমাকে, কতদূরে ? ও কি ওদেরই সাতবহিনির কেউ নাকি ?''[১০০] এক অকল্পনীয় প্রাপ্তিতে লেখক ডুবে যান, আচ্ছন্ন হন এক অপরিচিত আরণ্যক মদিরতায়। তাঁর মনে পড়ে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'পালামৌ'-এর কথা, সেখানেও তো এমন সুরসতিয়াদের কথা লেখা আছে। বনজ সারল্যে যারা নিজেদের উজাড় করে দিতে জানে, অথচ নাগরিক কপটতা যাদের ক্রমাগত ঠকায়, প্রতারিত করে। কালকূট-এর মনে পড়ে এঙ্গেলস-এর নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, ''সভ্য সমাজের মানুষেরা যখন অরণ্যের আদিবাসীদের দিকে চেয়ে দেখে, তখন তাদের চোখে থাকে স্পেকটিকল অব প্রসটিটিউশন।''[১০১]

অথচ কালকূটও আবিষ্কার করেন, এই আরণ্যক সমাজেও তাদের নিজস্ব সামাজিক ধ্যানধারণা, স্বতন্ত্র বোধ রয়েছে। তাদের যৌন ধ্যানধারণাও আধুনিক মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যে কামবৃত্তির দিকে টানবার জন্য আধুনিক মানুষ লোলুপ দৃষ্টিতে অরণ্যবালাদের দিকে তাকায়, অরণ্যের মানুষদের দৃষ্টিতে কিন্তু সেই পাপ নেই, কদর্য কামনা নেই। জীবনের কাঠামো গতিময় সভ্যতার আঁচড়ে অনেকটা ভেঙ্গেচুরে গেলেও এখনো আদিম সাম্যবাদের মূল সূত্রগুলো বনের সমাজে টিকে আছে। এখানে সতীত্বের সংজ্ঞা অন্যরকম। নারীর স্বতন্ত্র সত্তা এখানে মূল্য পায়, তাই নারীকে পুরুষের সমকক্ষতার জন্য আলাদা আন্দোলন করতে হয় না। এখানে সেই আদিম যুগ থেকেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রাধান্য। নারীর ভালোলাগা, ভালোবাসাকে তাই অসম্মান জানায় না এ সমাজ। অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতেও তাকায় না। সে কারণেই সুরসতিয়া তার তীব্র ভালোলাগা নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে নাগরিক অতিথি কালকূটের দিকে। মাত্র কয়েক ঘন্টার পরিচয়েই এক ভিনদেশী পুরুষের কাঁধে মুখ লুকোতে তার দ্বিধা হয় না, দু-হাত অনায়াসে পেতে দিতে পারে তাঁর কোলে, সকলের সামনে ওর 'প্রতিমা বক্ষের ওপর' কালকূটের হাতটি অকপটে চেপে ধরতে পারে। সুরসতিয়ার এই আচরণ অরণ্য-পটভূমিকায় অত্যন্ত স্বাভাবিক ঠেকে, অন্য অরণ্য নরনারীরাও এতে দোষনীয় কিছু খুঁজে পান না। কিন্তু কালকূট তো নগরের মানুষ, তিনি কিভাবে তাঁর ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়ে উঠবেন ? তাই তাঁর মনে হয়, ''এ রাত্রি আরণ্যক, নরনারী সকলেই আরণ্যক। কিন্তু আমার আরণ্যক হয়ে ওঠার অর্থ আলাদা। কী বিষম পরীক্ষা! আমার উর্ধ্বে আমি কেমন করে যাবো ? আমার প্রতিক্রিয়া যে অনিবার্য্য।''[১৯]

এক অনিবার্য্য যৌনতাড়না কালকূটকে আড়ষ্ট করে তুললেও সুরসতিয়া স্বচ্ছন্দ ছন্দে তাকে জড়িয়ে নেচে চলে। নির্দ্বিধায় বলে তার কোমর আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে। সে তার আচরণে, অভিব্যক্তিতে কখনোই হয়ে ওঠে না তথাকথিত 'সেক্সসিম্বল', দেহ অনাবৃত করে অতি আধুনিক রমণীরা যা হয়ে উঠবার চেষ্টা করে। সুরসতিয়া তার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে পুরুষ-শরীরের সঙ্গে মিশে থেকেও কামনার বস্তুতে রূপান্তরিত হয় না। এই অরণ্যে এই নৈকট্যও অত্যন্ত স্বাভাবিক ঠেকে। এক মুন্ডা রমণী গেয়ে ওঠে, ''নে জীবন গাতিউ , নে জীবন কাহি নামেগো।'' অর্থাৎ 'জীবনটা

পলকের রে। কুড়ি এমন জীবন আর পাবি না।' এই সহজ উচ্চারণের সঙ্গে বনের অন্ধকার থেকে ভেসে আসে ময়ূরের ডাক। বনজ সুর আর বুনো সুর একসঙ্গে মিশে কালকূটের অন্তর্চেতনায় এক অন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু হয়।-''মুহূর্তেই যেন এক আরণ্যক জীবন তার স্বরূপকে মেলে ধরলো, আর কেকাধ্বনি সেই স্বরূপের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। এমন মানবজীবন কেউ বিফলে দিতে পারে না, কেননা জন্মিলে মরিতে হইবে। অরণ্যে আবৃত ছায়া-ঘন গভীর এই পার্বত্য অঞ্চলের জীবনবোধের সঙ্গে কোথায় তফাৎ সভ্যতার আলোকের জীবনচিন্তার সঙ্গে ? সব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।''[১০০] কালকূট আরণ্যক গানের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেন মানুষের অন্তরের দর্শন, অরণ্য ও নগর দুয়েতেই এক। একাত্মতা আরো নিবিড় হয় বনের বনের সঙ্গে।

সুরসতিয়া ক্রমশঃ সেই নিবিড়তাকে ঘনীভূত করলো। সে নিজেই যেন বনজ-সম্মোহন। বনজ রমণী সূর্যমণির বানানো ডিয়েং বা হাড়িয়া গ্রহণ করতে তাঁর মধ্যে সহজাত দ্বিধা কাজ করে। কিন্তু সুরসতিয়ার রহস্যময় দৃষ্টি, নিরুচ্চার আহ্বান তাঁকে সম্মোহিত করে। ''সুরসতিয়া দুহাতে বাটি ধরে আমার সামনে ধরলো। এক মুহূর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোধ করলাম। সুরসতিয়ার অরণ্য-আদিম চোখের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে বাটি নিলাম।''[১০১] এ নিছক হাড়িয়া-পান নয়,কালকূট আসলে নিজেকে সমর্পণ করতে চাইছেন বনের কাছে, সুরসতিয়া তো তার অনুঘটক। একদিকে সুরসতিয়া, অন্যদিকে তার বান্ধবী মাংরি - অনবরত ডিয়েং পান করিয়ে তাকে মাতাল করে তোলে। কালকূট যেন আত্মসমর্পণ করেন তাদের কাছে। তাই তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, ''কালকূট ! এখন তুমি কার ? - এখন আমি বনের।- তবে চলো বনের সঙ্গে, খেল বনের লীলায়।''[১০২]

বনবালার হাত ধরে বনের সঙ্গে এই খেলায় সামিল হতে হলে একটি পরিষ্কার মন থাকা প্রয়োজন। বনবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন বলেই কালকূট তাদের জগতে প্রবেশ করতে পারেন।সুরসতিয়া স্বীকার করে,''তুমি অন্য দীখুদের মতো না।'' দীখু বা নগর-পুরুষদের চোখে তারা সীমাহীন কামনা এবং পরিশেষে প্রতারণাই পায়। সুরসতিয়ারা তাই জানে দীখুদের সঙ্গে তাদের মিল হতে পারে না। ''দীখুরা আমাকে

দেখলেই অন্যরকম করে তাকায়। পয়সা ছুঁড়ে দেয়, হাতছানি দিয়ে ডাকে। জরাইকেলায় কয়েকমাস আগে এক দীখু দিনের বেলা আমাকে তার গাড়ির মধ্যে জোর করে তুলে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল।...সে আমাকে যা খুশী তাই করতো, তারপরে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতো। বান্ডালুন্ডায় এরকম অনেক হয়েছে রেল লাইন পাতবার সময়। অনেক মেয়ে কখনো আর ঘরে ফেরেনি।''[১০৩] তাই কালকূটের চোখেও যদি সেই লালসার রঙ থাকতো, তাহলে সুরসতিয়ার কাছে অবশ্যই তিনি গৃহীত হতেন না। সারল্য দিয়েই তিনি সারল্যকে ছোঁবার চেষ্টা করেছেন। যদি তাঁর উদ্ধত নখের আঁচড় সুরসতিয়ার বুকে পড়তো, তাহলে কখনোই তিনি অরণ্যে আন্তরিক প্রবেশাধিকার পেতেন না। যেভাবে অরণ্য মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। সভ্যতার কুঠারাঘাত অরণ্যের কুমারীত্ব যেদিন থেকে নষ্ট করেছে, অর্থ উপার্জনের নোংরা লোলুপ দৃষ্টি যবে থেকে বৃক্ষচ্ছেদন করে চলেছে, অরণ্য ও নগরের মধ্যে সেদিন থেকেই সংঘাতের পরিবেশ রচিত হয়েছে। অরণ্য তাই বিশ্বাসের অমল চাহনীতে আর নগরের দিকে তাকাতে পারে না।

কালকূট সেই নাগরিক-ক্লেদ থেকে মুক্ত। তাই সুরসতিয়া অরণ্যের প্রতীক হয়ে তাকে কাছে টেনেছে। তার বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন সরল-দৃষ্টির এই লেখক। কালকূটের মধ্যেই সুরসতিয়া আবিষ্কার করে এক আরণ্যক পুরুষকে, যাকে সে চায়। 'বনের সঙ্গে খেলা'র শেষ ধাপে একদিন সে কালকূটকে নিয়ে যায় নির্জন অরণ্য-গভীরে। আদিম এক নারীর পাশে হাঁটতে হাঁটতে কালকূটও যেন এক আদিম পুরুষ বনে যান। আরণ্যক-এর সত্যচরণ যেভাবে ভানুমতীর পাশে চলেছিলেন অজানাকে জানতে, এখানে সম্মোহিত কালকূট যেন এক অন্য ভানুমতীর সঙ্গে। তাই তাঁর মনে পড়ে বিভূতিভূষণকে। এক অপূর্ব জলাশয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়, ''যাঁর চরণচিহ্ন ধরে, এই সারেন্ডা অরণ্যে এসেছিলাম , তিনি কি এই লোর দর্শন করেছিলেন ?''[১০৪] সত্যচরণ ছিলেন বিভূতিভূষণের চারিত্রিক আদর্শে বাঁধা, আর ভানুমতী ছিল এক লিরিকাল চরিত্র। কিন্তু কালকূট ও সুরসতিয়া রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠে আসে। সুরসতিয়া কালকূটের কাছে নির্দ্বিধায় বলে ফেলে, সে-ই তার কাঙ্খিত পুরুষ। নির্জন অরণ্যে সে গেয়ে ওঠে, ''এনাচি আবেনেবেন উরক্তনা'', অর্থাৎ 'এ বয়সটা গাছে জড়ানো লতার মতো।'[১০৫]

অথচ সে এমন কোনো ডাল এতদিন পায়নি, যাকে সত্যিই জড়ানো যায়। অরণ্যের আদিমতায় দাঁড়িয়ে সুরসতিয়ার মনে হয়, কালকূট আসলে 'অনেক বড়ো মুন্ডা', তাই সে নিঃসঙ্কোচে তাঁকে জড়িয়ে ধরে, যদিও সে জানে, ''আমি তো এই বন বুরুর মেয়ে। তুমি এখানে থাকবে না, আমি জানি। আমি কখনো তোমার সঙ্গে যাবো না, তাও জানি।''[১০৬] তারপর দেহ থেকে খাটো শাড়িটা খুলে ফেলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হল সে, নিজে হাতে অনাবৃত করলো কালকূটকে। দুজনেই যেন অরণ্য-আদিম। কালকূটের হাত ধরে সে নামালো জলাশয়ে। অঞ্জলি ভরে জল তুলে লেখকের বুকে কাঁধে ছড়িয়ে দিতে লাগলো। এখানে হঠাৎ যেন কালকূটের কলম কেড়ে নেন সমরেশ বসু। কিন্তু কালকূট তাঁর স্বতন্ত্র বোধে ফিরে আসেন অবিলম্বে। অরণ্য-রমণ নয়, গভীর দর্শণে চলে যান। -''মাতৃপূজার ছবি আমার চোখে। শক্তিস্বরূপিনী মহামায়া তোমার সামনে। আদিম আরণ্যক জলাশয়ে, এখন পূজার লগ্ন।''[১০৭] নগ্ন অরণ্যনারী কালকূটের বুকের কাছে থেকেও, একান্ত স্পর্শের সীমানায় থেকেও যেন অধরা মাধুরীতে রূপান্তরিত হয়। কালকূট আসলে সম্পূর্ণভাবে অরণ্যকে স্পর্শ করতে পারেন না।

গবেষক গঙ্গানাথ চক্রবর্ত্তী লিখেছেন,''প্রেম দেশকালপাত্রের ঊর্ধ্বে, স্বকীয় মাহাত্ম্যে সর্বস্তরে অভিন্ন হলেও, নগর-অরণ্যের সীমারেখার ধারে তার একটা সঙ্কোচের সামান্য অবস্থান থাকতে বাধ্য। যে সঙ্কোচ আমরা বারবার দেখেছি কালকূটের মধ্যে, বনের সঙ্গে খেলা বা মেলামেশার সময়কালীন অবস্থায়। কিন্তু সুরসতিয়ার মধ্যে, নাগর-প্রেমে মেশার আগে সেই দ্বন্দ্ব বা সংশয় দেখিনি। এমনকি সুরসতিয়াকে ভালোবাসতে চায় এমন অরণ্য-পুরুষ কান্ডোয়ার, সেই কান্ডোয়ারকেও সরাসরি প্রত্যাখ্যানের আচরণ এবং মনপ্রাণ দিয়ে লেখক-পুরুষটিকে গ্রহণ-এর যে ব্যতিক্রমী চরিত্রটি আমরা সুরসতিয়ার মধ্যে দেখলাম, তাতেই এই বোধটাই বিপুল হয়, সুরসতিয়ার চরিত্রের মধ্যে নাগরিক-সভ্যতার দীখু-লালায়িত প্রেম-বিলাস মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। বনশ্রীরাগের মহাজীবনকে যে লেখক 'আরণ্যকের' মধ্যে বেঁধেছেন, সেখানকার 'ভানুমতী' চরিত্র এবং বর্তমানের সুরসতিয়া চরিত্র যেন আদিম সভ্যতার মধ্যবর্ত্তী, বিপ্লবোত্তর কালের ছিন্নবিচ্ছিন্ন এক বিপরীতধর্মী চরিত্র।''[১০৮] বিভূতিভূষণের 'ভানুমতী' ও কালকূটের সুরসতিয়া দুজনেই অরণ্যনারী হওয়া সত্ত্বেও

তাদের মধ্যে এভাবেই পার্থক্য পরিস্ফুট হয়। প্রথম দর্শন থেকেই সুরসতিয়ার মধ্যে কালকূট-এর প্রতি একটা তীব্র টান অনুরণিত হয়, সে যেন নিজেকে সমর্পণ করবার জন্যই তৈরী। তাই দ্রুত এগিয়ে যায় নগরবাসী লেখক-পুরুষটির দিকে। তার অবচেতনে নিশ্চয়ই নগরের প্রতি মোহ তীব্রভাবে কাজ করেছে। তাই মুন্ডাপ্রেমিক কান্ডোয়ারকে অস্বীকার করে প্রায় অপরিচিত নগর-পুরুষের কাছে সে তার মনকে যেভাবে উন্মুক্ত করেছে, তেমনি দেহকেও অনাবৃত করতে কুন্ঠিত হয়নি। এখানে ভানুমতীর থেকে সুরসতিয়া আলাদা হয়ে যায়। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসের ভানুমতী-চরিত্রের কথা মনে পড়বেই কালকূটের 'বনের সঙ্গে খেলা'র সুরসতিয়া চরিত্রের দেখা পেলে। সাদৃশ্যের কারণে এই মনে-পড়া নয়, বরং বৈসাদৃশ্যের জন্যই এই মনে-পড়াটা তাৎপর্যপূর্ণ। ভানুমতী যে অর্থে অরণ্য-বালিকা, সুরসতিয়া সে-অর্থে অরণ্য-বালিকা নয়, সভ্যতার চলাচলতির ছায়া পড়েছে তার মনে। কালকূট জানেন, এখন আর ভানুমতীকে কোথাও পাওয়া যাবে না। ভারতবর্ষ পাল্টে যাচ্ছে। দ্রুত। তবু সুরসতিয়া কিন্তু শহরের মেয়ে নয়। আদিম প্রাণীর বেগ ও আবেগ তার মধ্যে ঢেউ তুলছে অবিরত। সভ্যতার আধুনিক প্রবেশ-দ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অথচ তার দেহে এখনো নদীর ঢেউ, গলায় এখনো অরণ্যের ভাষা।''[১৩৩] ভানুমতী যেন এক স্বপ্নের চরিত্র, কিন্তু সুরসতিয়া এমন এক আধুনিক অরণ্যনারী, যার মধ্যে স্বপ্ন ও বাস্তবের অপূর্ব মিশ্রন। অনাঘ্রাত অরণ্যে আধুনিক সভ্যতার ছায়া ক্রমে ক্রমে পড়েছে বলেই কালকূটের কলমে রক্তমাংসে উঠে এসেছে সুরসতিয়ার মতো চরিত্র। সুরসতিয়া নিজেকে অকপটে নিবেদন করলেও লেখক-পুরুষটি তাকে দেহজ-সুধায় গ্রহণ করেননি, তার কারণ - তিনি জানেন এতে সৌন্দর্য্য কেটে যাবে, ছন্দপতন হবে। যতই আধুনিকা হোক এই অরণ্যনারী, নগর ও অরণ্যের মিলন সম্ভবপর নয়। কলমের সৌকর্যে অরণ্য দুর্বার আকর্ষণীয় হবে নগরপাঠকের কাছে, রোমান্টিক পলায়নপরতার সুযোগ মিলবে কল্পনার অরণ্যে ও অরণ্যনারীতে। কিন্তু বাস্তবজীবনে অরণ্য-জীবন গ্রহণ করা সম্ভব নয়।তাই হঠাৎ করেই এদেলবা-পর্ব যখন শেষ হচ্ছে, অজিত সিং হঠাৎ নিতে এসেছেন লেখককে, এবার যেতে হবে থলকোবাদ, লেখকের সঙ্গে আর সুরসতিয়ার দেখা হয় না। একটি ছোট পাতার ঘরে এক হাত মাথার নীচে ও অন্য হাত বুকের ওপর রেখে সে ঘুমোচ্ছে। লেখক মনে মনে বললেন, ''ঘুম ভাঙিয়ে বিদায় নেবার থেকে,

নিঃশব্দে বিদায় ভালো। কারণ, জাগ্রত চাক্ষুস বিদায়, অনেক সময়, বিদায়ের স্বরূপকে চিনতে দেয় না। বিদায় সুরসতিয়া! আমার প্রণাম তোমার কালো শীতল দুটি পায়ে।''[১১০] দূর থেকে অরণ্য-নারীর পায়ে এই প্রণাম জানানোর মধ্য দিয়ে লেখক যেন বোঝাতে চাইলেন,এই অরণ্য নগর-মানবের আরাধনার বস্তু বা ক্ষেত্র হতে পারে, মুগ্ধ বিস্ময়ে ভালোবাসায় তার পূজা করা যায়, দৃষ্টির গভীরতা দিয়ে তার রূপের বন্দনা করা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে মিশে যাওয়া যায় না, তাকে চিরদিনের আশ্রয় বলে গ্রহণও করা যায় না। এই অবধারিত দূরত্বকে কোনভাবেই সরানো যাবে না।

'বনের সঙ্গে খেলা'র আরণ্যক মানুষ ও অরণ্যে কর্মসূত্রে থাকা মানুষগুলোর বেশীর ভাগই কিন্তু বাস্তব থেকে নেওয়া। পাক্ষিক 'সানন্দা' পত্রিকার ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৬ সংখ্যায় সমরেশ বসু পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তাঁর প্রিয় নারী হল 'বনের সঙ্গে খেলা'র সুরসতিয়া, যার বাস্তব নাম 'কয়ো'। সোমারি বাস্তবেও সোমারি, মোহনবাবু মৃন্ময়বাবু, সুরীন হল অনিল আর শুক্রম-এর বাস্তব চরিত্রের নাম বুধুয়া। 'বনের সঙ্গে খেলা'র অরণ্যকাহিনী যে নিছক কাল্পনিক নয়, তার প্রমাণে সানন্দা-য় প্রকাশিত সেই সাক্ষাৎকারের কিছু কিছু অংশ এখানে আমরা উদ্ধৃত করতে পারি -

''সারেন্ডার গভীর অরণ্য। কাঁকর আর পাথরের নুড়ি ছড়ানো পথে চলেছে জঙ্গলের ঠিকাদারের লরি। ঠিকাদার মৃন্ময়বাবু ড্রাইভারের পাশের আসনে। আমি আর আমার বন্ধু বড় টায়ারের ওপর পা ছড়িয়ে, লরির পেছনে। কাঠের পার্টিশনে হেলান দিয়ে বসেছি। আমাদের গায়ে প্রথম মার্চের রোদ।...আর অনিল নামে একজন চিত হয়ে শুয়ে বিড়ি টানছে। মোটর মেকানিক। এ যাত্রার উপলক্ষ বনভোজন না। ঠিকাদার চলেছেন গাছ কাটতে। গন্তব্য থলকোবাদ থেকে কিছুদূরে - বাহাদা। ...নির্বাসিন নয়, চলেছি অরণ্যের গভীরে কয়েকটি অনাস্বাদিত দিন কাটাতে। লরিটি হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে ব্রেক কষলো। মৃন্ময়বাবুর বাংলা আর হিন্দি বুলির ধমক শুনলুম -'এই ! তোরা এখানে কী করছিস ? বাহাদায় নেই গিয়া ?' বাঁ-দিকে তাকিয়ে দেখি, ঘন-জঙ্গলের সুঁড়িপথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দুই নারী।এক পুরুষ।...যুবা-পুরুষটির পরণে একটি প্রায় নেংটি। হাতে তীর-ধনুক। দুই নারীর কারোর গায়েই জামা নেই।...একজনের মাথার চুল আলগা খোঁপায় জড়ানো। সে-ই বোধহয় বয়সে বড়। অনুমান বিশ-বাইশ।

আর একজনের চুলে কবে বিনুনি বাঁধা হয়েছিল। এখন তার অনেকটাই শিথিল ও অবিন্যস্ত। সে কী অষ্টাদশী ? অনাবৃত শরীর নিয়ে কী আশ্চর্য অকুণ্ঠা!...মৃন্ময়বাবুর ধমক শোনা গেল -''দুদিন আগে গিয়ে সেখানে সবাই কাজ শুরু করে দিয়েছে। আর তুই বউ-শালী নিয়ে শিকার করে বেড়াচ্ছিস ? এদিকে সাতদিন আগে নাম লিখাকর আগাম পয়সা লিয়া। ওঠ জলদি, গাড়িতে ওঠ।''...তিনজনে গা-য়ে গা-য়ে বসতে না বসতেই লরি চলতে শুরু করলো...আমার চোখে বাস্তবিকই এঙ্গেলস-এর 'স্পেকটাকল অব প্রস্টিটিউশন' নেই। ...আমি অবাক ও মুগ্ধ।...দুই অরণ্যবালা সরু মিহি স্বরে গান ধরে দিল।...অনিল ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো -''ওরা আপনাদের নিয়ে গান করছে। ওরা বলছে, একটা বাবু চেনা। আরেকটা বাবু অচেনা। দুজনাই সিগারেট খাচ্ছে। কী সুন্দর তার গন্ধ। স্বাদও নিশ্চয় খুব ভালো। অথচ আমাদের দিকে বাবুদের একটু নজর নেই। আমাদের একটা সিগারেট দিচ্ছে না।''...প্যাকেট থেকে তিনটি সিগারেট বের করে বাড়িয়ে দিতে গেলুম। ওরা নিজেরাই প্রায় হামা দিয়ে এগিয়ে এলো। সিগারেট নিল আমার হাত থেকে। এক প্রস্থ খিলখিল হাসি এবং আবার দুজনের গান। অনিল আমার দিকে ফিরে বললো -''এখন আপনাকে নিয়ে গান করছে। আপনাকে আর বাবু বলছে না। বলছে, এ-মানুষটার নজর ভালো। মনটাও কি আমাদের মতো ? ওর নাম কী ? ও আমাদের সঙ্গে কথা কেন বলছে না।

''যত শুনি, ততই খুশিতে অবাক মানি। এতো আমাদের কবি-গান নয়। অথচ নাচে গানে এমন কথা চালাচালি ? নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললুম,''সমরেশ।''

''সম ?''-বুধুয়া এই পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারলো। তারপরেই তিনজনের উচ্ছ্বসিত হাসি। আমি ঘাড় বাঁকালুম।-''হ্যাঁ, সম।''

''বুধুয়া।''বুধুয়া নিজকে দেখালো। তারপর বিশ-বাইশের রমণী, ''সোমারি।''সোমারির পর তৃতীয়ার উজ্জ্বল কালো ডাগর চোখে সলজ্জ হাসি, ''কয়ো তো!''...কয়োর দিক থেকে আমার চোখ ফেরাতে সময় লাগছিল। আমার নিজের মধ্যে দেখলুম এক চিরকালের পুরুষ। কয়ো আবহমান কালের প্রকৃতি। ...বাহাদার অরণ্যে পাঁচদিন ছিলুম।...অনিল কেবল মোটর-মেকানিক নয়। আমাদের রান্নাটাও ওর হাতে ছিল। বাকি মেয়ে-পুরুষরা সারাদিনের কাজের শেষে এসে, একবার রান্না করতো। সকালে কাজে বেরোবার আগে, আগের রাত্রের জলঢালা

ভাত খেয়ে বেরতো।

''কিন্তু কয়ো একদিন কাজে গেল না। সে আমাকে সঙ্গী করে, অনায়াসে আমার হাত ধরে সারাদিন গভীর অরণ্যে ঘুরে বেড়ালো।...কয়ো আমাকে জানিয়েছে অরণ্যের আদিবাসী জীবনের অনেক রহস্য। আর শিখিয়েছে নাচ।...খাদ্যের চেয়ে ডিয়েং(হাঁড়িয়া) পানটাই বেশি হতো।...পঞ্চম দিনের প্রত্যুষে জীপ নিয়ে এলেন রেঞ্জার সাহেব শ্রী সিনহা।

আমাকে বললেন -''আপনাকে নিতে এসেছি।''...কয়ো ওর হিন্দিতে বললো,''আমি আজ কুমডি চলে যাবো। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।'' আমি সভ্য মানুষটি কয়োর চোখের দিকে তাকালুম। কয়ো তাকিয়েছিল। চোখে জল। হাসলো। আমার একটা হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। তারপর মুখ ফিরিয়ে চলে চলে গেল। তারপরেও কয়েকবার সারেন্ডা অরণ্যের বাহাদা, কুমডি, খলকোবাদ গিয়েছি। কয়োর দেখা পাইনি। কয়ো আমার প্রিয় নারী।''[১১১]

অরণ্য-পর্যটনের ষষ্ঠ দিন বেলা দুটোয় অজিত সিংজীর জীপে করে লেখক রওনা হলেন খলকোবাদের দিকে। সেইসঙ্গে শেষ হয়ে যায় 'বনের সঙ্গে খেলা'। এবার শুরু হবে অন্য পটভূমি, অবশ্যই অরণ্য-ছোঁয়া, যার ফসল এই সিরিজের শেষ উপন্যাস 'প্রেম নামে বন'।

'বনের সঙ্গে খেলা'তেও কালকূট খন্ড খন্ড ছবিতে, বর্ণনায় তুলে এনেছেন অরণ্য-জীবনযাত্রাকে। নিসর্গের পূজার পাশাপাশি এইসব আরণ্যক সংস্কৃতির উপস্থিতি বনগন্ধী করে তোলে অনায়াসে।

☐ আরণ্যক এই আদিবাসীদের মূল চারিত্রিক সম্পদ তাদের সারল্য ও সততা।অল্পতেই খুশী হবার মন্ত্র তারা জানে। লেখকের দেওয়া সামান্য সিগারেট তাদের কাছে তাই বিশাল প্রাপ্তির আনন্দ এনে দেয়।

☐ চরম দারিদ্রেও তারা আনন্দে থাকবার রহস্যটা জানে। দারিদ্র নিয়ে খুব একটা অভিযোগও নেই। দিনে একবার শুধু খালি ভাত আর লোয়াক বা ঝিনুক সেদ্ধ খেয়ে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম তারা করে চলে। গাছ কাটা, তাদের ওপর থেকে নীচে নামানো, মোটেও সহজ ব্যাপার নয়। দিনের পর দিন এই সামান্য খাবার খেয়ে এরা

নিষ্ঠা নিয়ে সে কাজ করে চলেছে। এদের এই নীরব অবদানেই সভ্য সমাজের অগ্রগমন।

☐ আরণ্যক মুন্ডা যুবক-যুবতীরা তাৎক্ষণিক গান রচনা করে মনের কথা নির্দ্বিধায় বলে দেয়। অকপটভাবে মন মেলে দেয় গানে গানে। কবিগানের ঢঙে পরস্পর কথাও বলে কখনো সুর করে করে। প্রাণোচ্ছল আরণ্যক জীবনের এক অনায়াস প্রকাশ। যেমন প্রণয়প্রার্থী মুন্ডা যুবক কান্ডেয়র সুরসতিয়ার উদ্দেশ্যে গায় - ''বিরিং আবু লীলশাড়ি, ভাটিওড়া পিড়িপিড়ি, খাসিয়া চানা বুচি বোওতল, নুকি দাংনো হেরি আঙ্গো, হহোরে কুড়ি।'' যার বাংলা করলে এমন দাঁড়ায় - ''চল নীল শাড়ি কিনে দিই। ভাটিখানা তো আজ ঘরে ঘরে। হাতে নেব ঘুগনি আর মুখখোলা বোতল। তুমি হাঁ করবে, আমি ঢেলে দেব, ওহে মেয়ে।''[১১২]

☐ আরণ্যক নারীদের মধ্যেও এক নিবিড় সারল্য।অরণ্য-রমণী প্রকাশ্যে বক্ষ উন্মুক্ত করে শিশুকে দুধ খাওয়ান। সুরসতিয়া নিঃসঙ্কোচে লেখকের হাত চেপে ধরে তার বুকে, জড়িয়ে ধরে।

☐ তা বলে নিজেদের সম্মান সম্পর্কেও অরণ্যনারীরা সচেতন প্রবৃত্তিগত (Instinct) স্বাভাবিকতায়। লেখক অরণ্যরমণীদের মধ্যে অনায়াসে গৃহীত হন,কারণ তাঁর দৃষ্টিতে পাপ নেই। অন্যদিকে কলকাতা থেকে আসা জনৈক জ্ঞানী সাহিত্যসেবী যখন মুন্ডানী সূর্যমণিকে দৈহিক লোভে ভোগ করতে চায়, তখন সেই ব্যক্তির কপাল কেটে রক্ত পড়ে,গায়ে কালসিটেপড়ে সূর্যমণিরই মারে।শহুরে মন নিয়ে শুদ্ধ অরণ্যকে স্পর্শ করা যায় না।

☐ আরণ্যক আদিবাসী জীবনে ডিয়েং বা হাড়িয়ার প্রভাব ভীষণ রকমের। সুযোগ পেলেই তারা মাতাল হতে ভালোবাসে। একটু অতিরিক্ত টাকা হাতে এলে তো কথাই নেই। কিন্তু সেই মাতলামির প্রভাবে গর্হিত অপরাধ কিছু ঘটে না। মাতাল হয়ে তারা জড়াজড়ি করে গান গায়, নাচে। ভুলে যেতে চায় প্রাত্যহিক দুঃখ-যন্ত্রণাকে।

☐ আরণ্যক যৌনচেতনাও নগরের থেকে আলাদা। সহজ মেলামেশার মধ্যেও যৌন অপরাধ এখানে খুব একটা ঘটে না। সভ্যসমাজের মানুষদের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেছেন - তাদের চোখে **Spectacle of prostitution** থাকে। যা দিয়ে তারা অরণ্য-রমণীদের দেখে। সে কারণে সভ্য পৃথিবীতে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনাও ঘটে - আফ্রিকার এক আরণ্যক রমণীকে আমেরিকায় একদা

ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল তার আকর্ষণীয় শরীরটাকে প্রদর্শন করার জন্য।লোলুপ চোখে নগর-মানুষেরা সেই শরীর ভীড় করে দেখতো, বিভিন্ন যৌনাঙ্গে স্পর্শও করতো। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেই হতভাগ্য আদিবাসী নারীর কঙ্কাল সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে নেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা সভ্যসমাজের অসভ্যতাকে প্রকাশ করে দেয় নগ্নভাবে। আর কালকূট যে অরণ্যের কথা বলেন সেই অরণ্যে যৌন মিলনের পথ কিন্তু নিছক শরীরী ভোগ নয়। মনের টান ও ভালোবাসা তার প্রধান শর্ত। মন সাড়া দিয়েছে বলেই সুরসতিয়া তীব্রভাবে লেখকের দিকে এগিয়ে যায়। নিঃসঙ্কোচে শরীরী স্পর্শ দিতে তার সামান্যতম কুণ্ঠা হয় না। একমাত্র মন চাইলেই শরীরী খেলায় তারা সামিল হয়। সমরেশ বসু 'দুই অরণ্য'-তেও লিখেছেন - হয়তো ডিয়েং খেয়ে মাতাল হয়ে দুজন অপরিচিত যুবকযুবতী পারস্পরিক সম্মতিতে অরণ্যে লুকিয়ে পড়লো, কিংবা বাইরে কাজে গিয়ে একাকীত্ব ভুলতে দুজন কাছাকাছি চলে গেল। তাই অপরাধবোধেও ভোগে না তারা। দরকার হয় না বেশ্যাবৃত্তির।

☐ অরণ্যজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাদের বিশ্বাস ও কুসংস্কার। এই উপন্যাসেও তার ছায়া পড়েছে। মাংরি-র মুখ থেকে লেখক জানতে পারেন গভীর অরণ্যে 'সাতবহিনি' বা এক পরী থাকে। যদি যুবক-যুবতীরা বনে তাদের দেখা পায় তাহলে তাদের মনে প্রেম-মহববত সঞ্চারিত হয় এবং তারা পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। অরণ্য-আদিম মন্ত্র এই সাতবহিনির চোখে, যাকে প্রেম-সম্মোহন বলা যায়। মাংরি-র ভাষায় -''উলোগ ভারি জঙ্গলমে কভি কভি দর্শন দেতা, যোয়ান লেড়কা অওর লেড়কিকো। সাতবহিনিকো দর্শন হোতা তো দিল মে মহববত আতা, লেড়কা লেড়কি পাগল হো যাতা, ঘর ছোড়কে চলা যাতা।''[১১৩]

☐ লেখক অরণ্য-অভ্যন্তরে আদিবাসী নাচের আসরে আদিম সাম্যবাদের চিহ্ন খুঁজে পান, যখন সামান্য চানাচুর সবাই মিলে ভাগাভাগি করে খায়।''চানাচুরের ঠোঙ্ হয়ে গেল, পঞ্চপান্ডবের দ্রৌপদী, যা আছে সবাই ভাগ করে খাও, একলার জন্য কিছু না। এটা এদের কাছে কোনো কিছু শিক্ষা না, এটাই নিয়ম।...কারোকে জিজ্ঞেস করাও দরকার হলো না,বাকী সবাইকে দেবে কিনা।''[১১৪] আমাদের মনে পড়ে যায় প্রাচীন সেই আরণ্যক জীবনযাত্রাকে,যেখানে কোনো আদিম জনগোষ্ঠী কিছু শিকার করলে সকলে ভাগাভাগি করে খেতো।

'বনের সঙ্গে খেলা'তেও অরণ্যের দৃশ্যরূপ নিপুণ কলমে ধরা পড়ে। খন্ড খন্ড নিসর্গবর্ণনা পাঠককে অরণ্যপ্রেমে আপ্লুত করে।

কালকূটের সারেন্ডা-অরণ্য পর্যটনের শেষ ফসল 'প্রেম নামে বন'। শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী লিখেছেন,''তিপু-সুরসতিয়া-তৃপ্তি - এই তিন নায়িকাবৃত্তের পরিমন্ডলে লেখকের নাগরিক-মন ও আরণ্যক-মন দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজের সংকটে যেমন নিজে ভুগেছে, আবার ঐ ত্রয়ীবৃত্তের পথ ধরেই প্রেমের স্থান-কাল-পাত্রের সীমাকে ছুঁয়ে প্রেমের বনে এসে এক স্বাভাবিক মুক্তির সন্ধানে নিজেকে 'উপযুক্ত' করে ছেড়েছে।...জটিলতার দ্বন্দ্ববৃত্তে তাঁর পদচারণ নেই। সরল রূপকে সরলভাবে দেখেও, যদি কোনো জটিলতার ইঙ্গিত সেখানে আসে, তখনই তিনি সেখান থেকে অবলীলায় পালিয়ে পালিয়ে যান। এটাই কালকূটের সহজাত সাহিত্য সত্তা। যেখানে তিনি জটিলতার চরম গভীরে প্রবেশ করেছেন, সেখানে তাঁর হাতে সমরেশের লেখনী। সেখানে তিনি কিতর্কিত। আর কালকূটে 'ব্যতিক্রম'।''[১১৫]

ষষ্ঠ দিনের বেলা দুটোয় বনের ইজারাদার অজিত সিংজীর জীপে এদেলবা থেকে নির্জন সারেন্ডা-খন্ডের আরণ্যক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে লেখক চললেন থলকোবাদের বাংলোয়। ছোট টিলার ওপর সেই বনবাংলো থেকে সারেন্দা-বনের বহুদূরের নিসর্গ চোখে পড়ে। শেষ উপন্যাসে কালকূট স্বীকার করলেন জীবনকে নতুন করে জানার জন্য, নিস্পাপ কামনার মধ্যে মাধুর্যের চরম ঐশ্বর্য্য পাবার জন্য বনের একান্ত সান্নিধ্যে আসা উচিত। সুরসতিয়া বনকে তার সব নির্যাস সহ লেখকের বুকে গেঁথে দিয়েছিল। তাই ভ্রমণের শেষ লগ্নে এসে তাঁর স্বীকারোক্তি - ''আমি প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছি। এ বনের নাম দেবো প্রেম বন।''[১১৬]

বনেই উন্মোচিত হয় ইজারাদার সিংজীর দ্বৈত সত্তা।-''আমি সরকারের ওপর সরকার নই, এই বনকে আমি ভালবাসি। এই বন আমার প্রেম। কিন্তু আবার ঠিকাদার হিসেবে এই বনই আমি ছিন্নভিন্ন টুকরো করি।''[১১৭] একদিকে তাঁর ক্রূরতা-লোভ-প্রতিহিংসা, অন্যদিকে পোলিও-আক্রান্ত সন্তানের জন্য বাৎসল্য দুটোই প্রকাশ হয়ে পড়ে বনজ পরিবেশেই।সিংজী-সীমা দাস-ফিলিপ ত্রিকোণ প্রেমপর্বের দেহজ গন্ধ ও জটিলতা কালকূট-সত্তায় কখনোই বনকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। অরণ্যনিবাসিতা তৃপ্তি ভৌমিকও লেখক-সত্তায় প্রেমজ অতৃপ্তি হয়েই

থাকেন। সকল সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে নাগরিক-লেখক কোন নারীদেহ সম্পূর্ণ প্রাপ্তিতে ছুঁলেন না - যা এই ইঙ্গিত বয়ে আনে যে, নগর কখনোই অরণ্যের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না। সুরসতিয়া বনেই হারিয়ে যায়, তৃপ্তি ভৌমিক ঢাকা পড়েন গাড়ির পেছনের রক্তিম ধুলায়, ফেরার সময় জরাইকেলার দিকে না গিয়ে লেখকের অন্যপথে চলে যাওয়ার অর্থ তিপুকেও অস্বীকার করা। পরিশেষে টিকে থাকল শুধু অরণ্যই, নারীর বদলে তার আবেদনই শাশ্বত হয়ে রইল -''যার প্রেমের বাহুডোরে আমি বাঁধা পড়েছি, অরণ্য তার নাম। সে আমাকে ডাক দিয়ে এনেছিল অনেক আগেই, ঘর ছাড়া করে। তখন আমি ভাবিনি, কী রূপের মোহ যে তার অঙ্গে ধারণ করে আছে। আমার বিচরণ এখন তার অঙ্গে অঙ্গে, তার অঙ্গের অভ্যন্তরে। শুকনো মৃত্তিকার গভীরে ছড়িয়ে দিয়েছে তার প্রস্রবণ। আমি এখন মাতাল হয়েছি। তার ফুল ফল লতাগুল্মের মদির গন্ধ আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে অবশ করেছে। 'চোখ গেল চোখ গেল' পাখিটার মতো, আমারও চিৎকার করে ডেকে উঠতে ইচ্ছা করছে। এখন তার বর্ণাঢ্য রূপ, চেয়ে দেখতে পারিনা। অথচ চোখও ফেরাতে পারি না। এক কথায় বলি, এই বনের সঙ্গে খেলতে খেলতে কখন আমি তার কোমল বাহুডোরের নিবিড়ে ধরা পড়েছি, খেয়াল করি নি।...এখন বন আমার প্রেম। সে আমাকে টেনে নিয়ে যায় তার আপন ঘরে, যার কোন সীমা নেই।''[১৩]

উল্লেখপঞ্জী

১) মন চল বনে, কালকূট,প্রথম সংস্করণ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, উৎসর্গপত্র

২) সমরেশ বসু রচনাবলী,তৃতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ,১৯৯৯। মুখবন্ধ,পৃষ্ঠা-৪-৫

৩) তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৩

৪) তদেব, মুখবন্ধ

৫) তদেব, পৃষ্ঠা-২১৫

৬) তদেব, পৃষ্ঠা-২১৬

৭) তদেব, পৃষ্ঠা-২১৬

৮) তদেব, পৃষ্ঠা-২৪০

৯) তদেব, পৃষ্ঠা-২৪৩

১০) তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৫

১১) তদেব, পৃষ্ঠা-২০২

১২) তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৫

১৩) তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৫

১৪) তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৫

১৫) তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৬

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৬

১৭) তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৭

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৭

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা-২৮৪

২০) তদেব, পৃষ্ঠা-২৮৪-২৮৫

২১) তদেব, পৃষ্ঠা-২৮৭

২২) তদেব, পৃষ্ঠা-২৮২

২৩) তদেব, পৃষ্ঠা-২৮২-২৮৩

২৪) তদেব, পৃষ্ঠা-২৮৭

২৫) তদেব, পৃষ্ঠা-২৮৭-২৮৮

২৬) সমরেশ বসু রচনাবলী,তৃতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করণ,১৯৯৯।পৃষ্ঠা-২৮৮

২৭) তদেব, পৃষ্ঠা-২৯১

২৮) তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৩

২৯) তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৩

৩০) তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৫

৩১) তদেব, পৃষ্ঠা-১৯০

৩২) তদেব, পৃষ্ঠা-২২২

৩৩) তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৬

৩৪) তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৬

৩৫) তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৯

৩৬) তদেব, পৃষ্ঠা-২৫৮

৩৭) তদেব, পৃষ্ঠা-২৬০

৩৮) তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৩

৩৯) তদেব, পৃষ্ঠা-২১৫

৪০) তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৩

৪১) তদেব, পৃষ্ঠা-২৫৬

৪২) তদেব, পৃষ্ঠা-২৬৩

৪৩) তদেব, পৃষ্ঠা-২৬৫

৪৪) তদেব, পৃষ্ঠা-২১৫

৪৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৫

৪৬) তদেব, পৃষ্ঠা-২৫২

৪৭) তদেব, পৃষ্ঠা-২০৪

৪৮) তদেব, পৃষ্ঠা-২২৭

৪৯) তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৩

৫০) তদেব, পৃষ্ঠা-২৫১

৫১) কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে, শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী,সাহিত্যায়ন,১/১বি, ডাঃ অমল রায় চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর,১৯৯৫। পৃষ্ঠা-২১৫

৫২) তদেব, পৃষ্ঠা-২১৮-২১৯

৫৩) বনের সঙ্গে খেলা, কালকূট, প্রথম সংস্করণ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৫৬

৫৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৫২

৫৫) মন চল বনে, কালকূট,প্রথম সংস্করণ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-১০

৫৬) তদেব, পৃষ্ঠা-১০

৫৭) তদেব, পৃষ্ঠা-১৫

৫৮) তদেব, পৃষ্ঠা-২০-২১

৫৯) তদেব, পৃষ্ঠা-৪২

৬০) তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩

৬১) তদেব, পৃষ্ঠা-৪৪

৬২) তদেব, পৃষ্ঠা-৪৪

৬৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৯৬

৬৪) তদেব, পৃষ্ঠা-১০০

৬৫) তদেব, পৃষ্ঠা-৯০

৬৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৯৮

৬৭) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৮

৬৮) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৪

৬৯) কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে, শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী,সাহিত্যায়ন,১/১বি, ডাঃ অমল রায় চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর,১৯৯৫। পৃষ্ঠা-২২২

৭০) মন চল বনে, কালকূট,প্রথম সংস্করণ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৮৮

৭১) তদেব, পৃষ্ঠা-৮৯

৭২) তদেব, পৃষ্ঠা-৮৯

৭৩) মন চল বনে, কালকূট, প্রথম সংস্করণ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৮৯

৭৪) দিনের পরে দিন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৩, মিত্র অ্যান্ড ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-৩৯৫

৭৫) মন চল বনে, কালকূট,প্রথম সংস্করণ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-১১০

৭৬) তদেব, পৃষ্ঠা-১৩০

৭৭) তদেব, পৃষ্ঠা-১৩২

৭৮) তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৫

৭৯) তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৯

৮০) তদেব, পৃষ্ঠা-১৪০

৮১) তদেব, পৃষ্ঠা-১৫২

৮২) তদেব, পৃষ্ঠা-১৫২

৮৩) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬০-১৬১

৮৪) তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৪

৮৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৫

৮৬) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৪

৮৭) তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৮

৮৮) তদেব, পৃষ্ঠা-১৭২-১৭৩

৮৯) তদেব, পৃষ্ঠা-১৭৪

৯০) কালকূট রচনা সমগ্র,কালকূট,প্রথম সংস্করণ,মৌসুমী প্রকাশনী,১এ কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৭১৫

৯১) তদেব, পৃষ্ঠা-৭২৪

৯২) তদেব, পৃষ্ঠা-৭২৩

৯৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৭২৩

৯৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৭২৩

৯৫) কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে, শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী,সাহিত্যায়ন,১/১বি, ডাঃ অমল রায় চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর,১৯৯৫। পৃষ্ঠা-২২৭

৯৬) কালকূট রচনা সমগ্র,কালকূট,প্রথম সংস্করণ,মৌসুমী প্রকাশনী,১এ কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৭৩৪

৯৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩৮

৯৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৪০

৯৯) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৪৩

১০০) কালকূট রচনা সমগ্র,কালকূট,প্রথম সংস্করণ,মৌসুমী প্রকাশনী,১এ কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৭৩৯

১০১) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩৮

১০২) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩৯

১০৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৪৪

১০৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৫৪

১০৫) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৫৫

১০৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৫৪

১০৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৫৫

১০৮) কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে, শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী,সাহিত্যায়ন,১/১বি, ডাঃ অমল রায় চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর,১৯৯৫। পৃষ্ঠা-২৩৫

১০৯) তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৫-২৩৬

১১০) কালকূট রচনা সমগ্র,কালকূট,প্রথম সংস্করণ,মৌসুমী প্রকাশনী,১এ কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৭৫৬

১১১) পাক্ষিক সানন্দা, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৬,এ বি পি প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১

১১২) কালকূট রচনা সমগ্র,কালকূট,প্রথম সংস্করণ,মৌসুমী প্রকাশনী,১এ কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৭৪২

১১৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩৭

১১৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৪৮

১১৫) কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে, শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী,সাহিত্যায়ন,১/১বি, ডাঃ অমল রায় চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ-ডিসেম্বর,১৯৯৫। পৃষ্ঠা-২৩৯

১১৬) কালকূট রচনা সমগ্র,কালকূট,প্রথম সংস্করণ,মৌসুমী প্রকাশনী,১এ কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৭৫১

১১৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৬০

১১৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৬৭